নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি-110016
কর্তৃক প্রকাশিত এবং বিউটি প্রিন্ট, পাহাড়গঞ্জ, নয়াদিল্লি-110055 থেকে মুদ্রিত।

ভূমিকা

পাঞ্জাবের ভাষা ও 'সংস্কৃতি তার দেশের মাটির কাছাকাছি থাকার পক্ষপাতী। যদিও সভ্যতার নিত্যনতুন বৈচিত্রময় বিকাশের সাথে পা মিলিয়ে চলতে পাঞ্জাববাসীরা সর্বদা সচেষ্ট, তবু তারা ঐতিহ্যময় অতীত এবং সহজ সরল জীবনবোধের প্রতি আন্তরিক থাকতে চায়। পাঞ্জাবের ধর্মচেতনা এবং শিল্পকলা দুই ক্ষেত্রেই আমরা এই সরলতার সমর্থন পেয়ে থাকি। এদেশের মাটিতে যে ধর্মভাবনা, নৃত্য-সঙ্গীত, কবিতা অথবা স্থাপত্য শিল্পের জন্ম হয়েছে তার কোন কিছুতেই বিশেষ কোন জটিলতা নেই। আধুনিকতার সঙ্গে দ্রুত তাল মিলিয়ে চললেও পাঞ্জাব সহজ সরল জীবনবোধের প্রতি গভীর আস্থা রাখে এবং সেই সাথে নিজের ঐতিহ্যময় অতীতকেও আঁকড়ে থাকতে চায়।

আধুনিকতার সঙ্গে অতীত পরম্পরার সহজাত মিলনই পাঞ্জাবের উপকথার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগীয় পাঞ্জাব বিদেশী আক্রমণকারীদের অনেক বিশেষত্ব আত্মস্থ করেছিল, কিন্তু নিজস্ব স্বাভাবিক সরলতা দিয়ে সে সব বিশেষত্বকে এমন স্বকীয় ধাঁচে গড়ে নিয়েছে যে আজ সেগুলোকে দেশী বা বিদেশী ধারা বলে আলাদা করে সনাক্ত করার কোন উপায় নেই। অবশ্য ভাষাতত্ত্বের চুলচেরা বিচার করতে বসলে হয়ত দেখা যাবে কিছু কিছু শব্দ এবং কবিতার কোন বিশেষ ভঙ্গিমা এই বিদেশী আক্রমণকারীরা একদিন তাদের সঙ্গে করে পাঞ্জাবে এনেছিল, কিন্তু পাঞ্জাবী কবিদের সাধুবাদ দিতে হয়, তারা নিজের দেশের মাটি থেকেই হীর-রাঞ্ঝা, মিরজা-সাহিবান, সোহনী-মহীওয়াল, সস্সী-পুন্নু, পূরন ভগত ও রাজা রসালু প্রভৃতি এমন সব কাহিনী সৃষ্টি করেছে, যেগুলো বাদ দিয়ে আজ পাঞ্জাবী কাব্য সাহিত্যের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। পাঞ্জাব যে কত আন্তরিক ভালবাসায় ভিনদেশীকে আত্মীয় করে নিতে পারে তার পরিচয় সোহনী-মহীওয়াল ও সস্সী-পুন্নুর গল্পের নায়কদের দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

গুজরাতের নিকটবর্তী এক গ্রামের কুমোরের মেয়ে সোহনীর প্রেমে আবদ্ধ হয়ে যে সুদর্শন, সম্ভ্রান্ত রাখাল পাঞ্জাবের মাঠে ঘাটে গরু মহিষ চরাতো সে আসলে মধ্য এশিয়ার এক রাজবংশের ছেলে। তেমনি সস্সী পাঞ্জাবের এক ধোপার ঘরে মানুষ হয়েছিল—তার প্রেমিক পুন্নু বেলুচিস্থানের পরদেশী, দুস্তর মরুভূমি পার হয়ে সে এখানে এসেছিল একদিন। সহতীর প্রেমাস্পদ মুরাদও বেলুচিস্থানের বাসিন্দা। পাঞ্জাবী কবিরা তাদের প্রিয় এই সব লোকগাথায় বিদেশী নায়কদের স্থান দিয়ে তাদেরকে আপন করে কাছে টেনে নিয়েছে। পাঞ্জাবী জীবন মানস ও শিল্পকলার এটাই এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। এবং সব থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার হল, এই কাহিনীগুলিতে কোথাও স্বদেশ-বিদেশ নিয়ে কোন ভেদাভেদের সংঘাত নেই। কেবল

মাত্র ভিনদেশী এই কারণে কোন নায়ককে কোথাও অস্বীকার করা হয়নি। সস্‌সীর বাবা তো খুশি হয়ে পুন্নুর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিল। অ-পাঞ্জাবীকে নিজেদের আচার আচরণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে পরিবারভুক্ত করার এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র পাঞ্জাবী কবিতারই উপজীব্য নয়, এটা সামগ্রিকভাবে পাঞ্জাবী জীবনবোধেরই এক বিশেষত্ব। পাঞ্জাবী ভাষা, পাঞ্জাবী স্থাপত্য কলা এবং পাঞ্জাবী সঙ্গীতে এই একই প্রভাব দেখা যায়। এটাকেই পাঞ্জাবের উদার এবং সতত বিকাশশীল স্বভাবের এক বিশেষ গুণ বলা যেতে পারে।

পাঞ্জাবী লোকগাথা কেবল পরদেশীকেই পাঞ্জাবী করেনি, পাঞ্জাবের তরুণকেও বিদেশে প্রেমিকের ভূমিকায় তুলে ধরেছে। এই কাহিনীগুলির বেশির ভাগেরই জন্মকাল মধ্যবর্তীযুগ; সে সময়ে যাতায়াতের সুবিধের জন্যে রাস্তাঘাটের, রেলগাড়ী কিংবা জাহাজ ইত্যাদির বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। তখন পঞ্চাশ মাইল যাত্রা আর পাঁচশো মাইল যাত্রা প্রায় সমান দুর্ভোগের। নদী পারাপারের জন্য সেতু ছিল না। শ্রাবণের ভরা নদী আর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের তপ্ত মরুভূমি অতিক্রম করা একই রকমের কষ্টসাধ্য ছিল। লোকেদের মুখে প্রবাদ প্রবচনের মতই বহুশতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিল—'জা ধীয়ে রাবী, না কোই আবী না কোই জাবী' (ইরাবতীর ওপারে তোর ঘর মা, না তোর কাছে কেউ যেতে পারে, না তোর খবর নিয়ে ওপার থেকে কেউ আসতে পারে)। আর সত্যি করে দেখতে গেলে নদীর অপরপার সে-সময়ে আমাদের কাছে বিদেশই ছিল প্রায়। মানুষের ধ্যান-ধারণার এমনই এক পরিবেশে হীর-রাঞ্ঝার কাহিনীর সূত্রপাত। পাঞ্জাবী লোককথার প্রায় সব নায়কই ভবঘুরে মুসাফির এবং পাঞ্জাবের প্রেম-ভাবনার সঙ্গে মুসাফিরের সম্পর্ক বিশেষ গভীর। নিজের ঘর-বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কহীন রাঞ্ঝা ছড়ি হাতে হীরের ক্রোধদীপ্ত মূর্তি দেখে বলে ওঠে:

রাঞ্ঝা আখদা এহ্ জহান সুপনা,
মর জাওণা ঈ নৈনাঁ বালীয়ে নী।
তেরে জয়ে পিয়ারিয়া এহ্ লাজম,
আয়ে গায়ে মুসাফরা পালীয়ে নী ॥[1]

পর্যটন আর প্রেম এই দুয়ের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলে কবি বারিশ শাহ্ পাঞ্জাবী চরিত্রের এই সুপ্ত তাত্ত্বিক দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। পাঞ্জাবী লোকগাথার চরিত্রেরাই শুধু নয়, এদেশের লোকনায়কেরাও নিজেদের ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই পাঞ্জাবী প্রেমের যোগ্য প্রতিনিধি হতে পেরেছেন। পাঞ্জাবের অদ্বিতীয় মহান লোকনায়ক গুরু নানকের দৃষ্টান্ত তো আমাদের চোখের

1. রাঞ্ঝা বলে, বিশ্বজগৎ আজ স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। হে সুন্দরী, তোমার জন্যে এ জীবন উৎসর্গ করতে পারি। তোমার মত এমন সুন্দর রমনী বিধাতা কেবল আমার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন।

সামনে রয়েছে—তিনি তাঁর কর্মবহুল জীবনের বেশিরভাগই তো চতুর্দিকে ভ্রমণ করে কাটিয়েছেন। গুরুগোবিন্দ সিং, যিনি আজীবন পাঞ্জাবের সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, তিনি তাঁর আবির্ভাবের শুভলগ্ন থেকে নির্বাণ লাভের ব্রাহ্মমুহূর্ত পর্যন্ত নিজের জন্মস্থান থেকে দূরে কাটিয়ে গেছেন। দূর দেশান্তরে যাবার ব্যগ্র প্রতীক্ষায় আজও পাঞ্জাবীরা দিন গোণে। দেখে শুনে এমন ধারণা জন্মায় যে পাঞ্জাবী প্রতিভা যেন তার ঘর ছেড়ে বাইরে আসার পরই সম্যকভাবে বিকাশিত হয়ে ওঠে। প্রেমের কাহিনীর নায়ক রাঞ্ঝা প্রভৃতিরা নিজের দেশ থেকে বহুদূরে তাদের লীলাক্ষেত্র নির্বাচন করেছে ; পূরন ভগত, রাজা রসালু এবং দুল্লা ভট্টী প্রভৃতি ভক্ত ও বীর নায়কেরাও সেই একই পথের পথিক। পূরনকে অবশ্য তার বিমাতার খামখেয়ালী স্বভাবের শিকার হয়ে ঘর ছাড়তে হয়েছিল, কিন্তু রাজা রসালু স্বেচ্ছায় পরবাসী হয়েছিলেন। তারা ছন্নছাড়ার মত জীবন কাটাতে ভালবাসলেও দুজনেই জীবনে প্রেমের দেখা পেয়েছিলেন। রাণী সুন্দরা পূরনকে নিজের করে পাবার চেষ্টা করেছিল। সুন্দরা এমন এক দেশের শাসনকর্ত্রী যেখানে কেবল স্ত্রীলোকের হুকুমই মেনে চলার রেওয়াজ ছিল। তেমন দেশ যে পাঞ্জাবের বাইরের কোন অঞ্চল সেটা বেশ বুঝতে পারা যায়। রাজা রসালুও সিরিকোটের নৃপতি সিরকপের নবজাত কন্যা কোকলাঁকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ধারণা করা হয়, সিরকপের রাজ্যও পাঞ্জাবের বাইরের কোন দেশ ছিল। দুল্লার জন্ম পাঞ্জাবে, এদেশেই মানুষ হয়েছে সে। সারা জীবন তার এদেশের মাটিতে কাটলেও নিজের জীবন যাপনের এমনই এক পথ সে বেছে নিয়েছিল যে দুদণ্ড বাড়ীতে স্থির হয়ে সে কাটাতে পারেনি। আমাদের নায়কেরা শুধু গৃহছাড়া নয় তারা নির্বান্ধবও। জীবনের চলার পথ তো আমাদের একলাই অতিক্রম করতে হবে, সেখানে কেউই আমাদের সঙ্গী নয়। এই গৃহহীন বন্ধুহীন জীবনে বিদেশী জগতের প্রেম-প্রীতিই শুধুমাত্র ভরসা আমাদের এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত তা জীবনের দুঃখ বেদনার মুহূর্তে আমাদের কাছে এসে ধরা দেয়। এই প্রেম-ভাবনাই দেশ বিদেশের মধ্যে তফাৎ ও দূরত্ব দূর করে দেয় এবং এই দূরত্ব কেটে যাবার পরই পাঞ্জাবী প্রতিভা তার প্রকৃত দীপ্ত মহিমায় ফুটে ওঠে।

যদিও এই লোকনায়কদের ঘটনা আমাদের বিশিষ্ট কবিরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, কিন্তু তাদের লেখনীর মুখে প্রকাশিত হবার বহু আগেই এই সব কাহিনী কিংবদন্তীর মত পাঞ্জাবী জনমানসের অন্তঃস্থলে স্থান করে নিয়েছিল। পাঞ্জাবী কবিরা কেবল বিদেশী নায়কদেরই নয়, তারা বহু বিদেশী লোকগাথাও বাইরের থেকে আমদানী করেছে। লায়লা-মজনু, শীরি-ফরহাদ, সৈফ-উলমলুক, ইউসুফ-জুলেখা প্রভৃতি কাহিনী আমাদের কবিদের ভাল লাগে। এদের নিজের করে নিয়ে পাঞ্জাবী কবিরা অনিন্দ্য সুন্দর সব কাহিনী রচনা করেছেন। কিছু কিছু পাঞ্জাবী লোকগাথা আবার ভারতের অতীত ঐতিহ্যময় জীবনধারার সঙ্গেও যুক্ত। কিন্তু পাঞ্জাবী জনমানস তার নিজের দেশের মাটিতে উদ্ভূত কাহিনীকে যে মান্যতা দিয়েছে

তেমনটি আর কারো ভাগ্যে জোটেনি। যতদিন এই পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে পাঞ্জাবের চার অমর কাহিনী চারজন পাঞ্জাবী কবিকে চির-স্মরণীয় করে রাখবে। কবিদের নাম আজ আর তাদের রচিত গল্পের নামের থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। হীর-বারিশ, সস্সী-হাশিম, সোহনী-ফজল শাহের নাম লোকদের মুখে মুখে ফেরে। পিলুর মিরজা এবং কাদরইয়ারের পূরন ভগতও এক নিঃশ্বাসে স্মরণযোগ্য। কবি এবং তার গল্পের নায়কের মধ্যে পার্থক্যের কোন চুলচেরা রেখা পর্যন্ত টানা সম্ভব নয়। এই অভিন্নযোগসূত্রের কারণ হল, গল্প-কবিতায় রূপ নেওয়ার আগেই কাহিনীগুলি পাঞ্জাবী জনমানসে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল। ফলে বারিশ, হাশম, পীলু প্রভৃতি সার্থকনামা কবিদের কবিতা যখন লোকেদের ভাল লাগল কবিরা তখন সহজেই লোকেদের মনে স্থায়ী আসন গ্রহণ করে নিলেন। প্রত্যেক কাহিনির ওপর ভিত্তি করা লোককাব্যের কোন-না-কোন অংশ খুঁজলে আজও পাওয়া যায় :

চলো সঈয়ো চল বেরুণ চলীয়ে,
রাঞ্ঝে দা চুবারা নী।
হীর নিমাণী ইটাঁ চোবে,
রাঞ্ঝা চোবে গারা নী।[1]

সোহণী হিজর দে দীবে পই বালদী,
কোঈ খবর লয়াবে মহীবাল দী।[2]

না জাবী রাঞ্ঝা বে,
সাণূঁ বইরে গমাঁ বিচ্চ রোড় কে।[3]

কোঈ জাবো সঈয়ো নী,
রাঞ্ঝণ ণূঁ ল্যাবো মোড় কে।[4]

চল নিয়াঁ করাঈয়ে বে,
রাঞ্ঝণা তূ কালা মৈ গোরী।[5]

লোকেরা নিজেরাই এমনিভাবে অনেক পংক্তি রচনা করে চলেছে। কিছুকাল এসব পংক্তি লোকমুখে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও একসময়ে তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। কিন্তু দুল্লা ভট্টী আর সুন্দরাকে নিয়ে লেখা এমনই এক কাব্যাংশ অমর হয়ে

1. সখী, চলো রাঞ্ঝার অসমাপ্ত আটচালা দেখতে যাই। বেচারী হীর ইট আর রাঞ্ঝা চূণ সুরকী বইছে আজো।
2. সোহনী বিরহের প্রদীপ জ্বেলে বসে আছে। কেউ মহীওয়ালের খবর এনে দিও তাকে।
3. রাঞ্ঝা, আমাকে এই অন্তহীন দুঃখের মধ্যে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যেয়ো না।
4. সখী, তোমরা কেউ রাঞ্ঝাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।
5. চলো, আজ সত্য বিচার করিয়ে আসি। রাঞ্ঝা তুই কালো আর আমি তোর থেকে অনেক বেশি ফর্সা।

রয়েছে। আজও 'লোহরী' উৎসবের দিন (দোলের আগের দিন) ছেলেরা সেই ছড়াগুলি শুনিয়ে 'লোহরী'র চাঁদা আদায় করে। মূল কাহিনী হয়তো লোকে ভুলে গেছে, কিন্তু কোন্ শুভ মুহূর্তে কোন লোক-কবি যে নীচের ছড়াটি রচনা করেছিল কে জানে, কিন্তু আজও তা লোকের মুখে মুখে ফিরছে—

সুন্দর মুন্দরিয়ে হো
তেরা কৌন বিচারা, হো
দুল্লা ভট্টীবালা, হো
দুল্লে ধী ব্যাহী, হো
সের শক্কর আঈ, হো
কুড়ো দে বোঝে পাই, হো
কুড়ী দা লাল পটাখা, হো
কুড়ী দা সালু পাটা, হো
সালু কৌন সমেটে, হো
চাচা গালী দেসে, হো
চাচে চূরী কুট্টী, হো
জিমীন্দারাঁ লুট্টী, হো
জিমীন্দার সদাঁয়ে, হো
গিন-গিন পৌলে লায়ে, হো

এটি একটি উল্লেখযোগ্য লোকগীতি, যদিও মূল কাহিনীর পারম্পর্য এখানে ঠিকমত রক্ষা করা হয়নি। অবশ্য লোকগীতির চরিত্রই তাই। গল্প তো সকলেই জানে, লোককবি সেই জানা গল্পটিকে নিজের মনের মত করে নতুন সাজে ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন। সুন্দরা অল্প বয়সেই মাতৃহীন হয়েছিল, বাপের স্নেহচ্ছায়াও সে কোন দিন পায়নি। তার কাকা ছিল জমিদার। একবার সে-অঞ্চল দিয়ে দলবল সহ আকবরের যাবার কথা। জমিদারেরা ঠিক করল সুন্দরাকে বাদশাহের কাছে নজরানা হিসেবে পেশ করবে। গ্রামের সব থেকে রূপসী (লাল পটাখা) আর সকলের থেকে গরীব (ফটে সালুবালী) সেই ভাগ্যহীনা মেয়েকে কে আর রক্ষা করতে পারে? কথাটা দুল্লা ভট্টীর কানে গিয়ে পৌঁছয়। দুল্লা ছিল দীন-দুঃখীর হিতৈষী—সে তার মেয়ের বয়সী সুন্দরাকে তৎক্ষণাৎ বিয়ে করে আশ্রয় দেয়। সময় অল্প থাকার জন্য বিয়ের কোন ধুমধাম করাও সম্ভব ছিল না। কোন রকমে নমো নমো করে বিয়ের পাট শেষ হয়। কিন্তু দুল্লা ভট্টী সেই কুচক্রী জমিদারদের যথেষ্ট নাকাল করেছিল। এমনিভাবেই লোকগীতির জগত থেকে বেরিয়ে এসে পাঞ্জাবের লোক নায়কেরা গল্পের দুনিয়ায় নিজেদের স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। কাহিনীর নায়ক হিসেবে খ্যাত হবার আগেই তারা লোকগীতি আর কাব্যের নায়ক ছিল। এই সমস্ত লোক নায়কেরা আমাদের পাঞ্জাবের সাদাসিধে সরল লোকধর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। 'সুন্দর-মুন্দরিয়ে' লোকগীতি এবং অন্যান্য কাহিনী থেকে পাঞ্জাবের লোকধর্মের পরিপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। পাঞ্জাব তার অনিন্দ্য সুন্দরীর

রূপ যৌবনকে কোন না কোন উপায়ে ছিন্ন-বসন দারিদ্রের সাথে যুক্ত করে রেখেছে। কুমোরের মেয়ে সোহনী, ধোপানী সস্‌সী, রাখাল আজিমবেগ এবং রাখাল রাঞ্ঝা প্রভৃতিরা পাঞ্জাবের অনন্য-সুন্দর কিন্তু দরিদ্র যৌবনের প্রতীক। রাজার ছেলে পূরন আর রসালুর লোককথাও যথেষ্ট জনপ্রিয়। তার প্রধান কারণ রাজার ছেলে হয়েও তারা রাজ্যপাট অবহেলায় ত্যাগ করে গরীব ভবঘুরের মত দিন কাটিয়েছে। পাঞ্জাবী লোকপ্রতিভা দরিদ্রের সৌন্দর্যকে সাহিত্যে স্বীকৃতি দিয়েছে। লোকস্বীকৃতির দ্বিতীয় কষ্টিপাথর হল সত্য আচরণ। আলোচ্য এই গীতে দুল্লা সুন্দরাকে তার নিজের কন্যার স্থান দিয়েছে। হীর রাঞ্ঝার প্রেমের ব্যাপারে পঞ্চপীরের সমর্থন রয়েছে। পূরন তার গুরু গোরখনাথের বর পেয়েছিল। এই ধরণের ছোট-খাটো ঘটনা প্রায় প্রতি গল্পেই পাওয়া যায়। প্রেম অথবা সন্ন্যাস, চুরি অথবা সাধুতা সর্বত্রই এই ন্যায় আচরণ যেন ধর্ম্মীয় সত্যের মত বিদ্যমান রয়েছে দেখা যায়। এই সত্য আচরণ দারিদ্র্যকেও তার নিজস্ব মহিমায় ঐশ্বর্যবান করে তুলেছে।

পাঞ্জাবী উপকথার তৃতীয় উল্লেখযোগ্য গুণ হল, ব্যক্তি স্বাধীনতার অনুভাবনা। এই ব্যক্তি স্বাধীনতা বহু ক্ষেত্রেই পারিবারিক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে—কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই সে পারিবারিক বাধা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে। ব্যক্তির সঙ্গে পারিবারিক আদর্শের সংঘাত পাঞ্জাবী উপকথায় এমন এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে তা বাদ দিয়ে কোন কাহিনী ভাবাই যায় না। পাঞ্জাবী প্রেমিকেরা সাংস্কৃতিক সংযমের মধ্যে থাকতে চাইলেও পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে থাকতে রাজী নয়। প্রত্যেক পঞ্চনদবাসী সর্বস্বীকৃত কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অধীনতার মধ্যে থেকেও নিজের জীবনের সমস্যার সমাধান নিজে করার চেষ্টা করে। যেখানেই ব্যক্তির ভাগ্য-নির্ণয় পরিবার পরিজনেরা করতে গেছে, সেখানেই সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছে। সুন্দরার কাকা সুন্দরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সম্রাটের বিলাস সামগ্রী বানাতে গিয়েছিল, সেক্ষেত্রে লোকধর্ম তার বিরোধিতা করেছে। হীর, সোহনী আর সাহিবান তাদের বিয়ের ব্যাপারে নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়েছে। সস্‌সী তার নিজের পরিবারের সমর্থন লাভ করলেও তার স্বামীর পরিবার এসে বাধ সাধে। পূরনের দুঃখের কাহিনীর সূত্রপাতও সৎমা আর পিতা রাজার খামখেয়ালী সিদ্ধান্তের জন্যেই হয়েছিল। মা-বাবা তাদের ছেলের ইচ্ছাকে নিজেদের বিচার ধারায় চালিত করতে চেয়েছিল, কিন্তু ছেলে তার নিজস্ব স্বাধীন চিন্তার ব্যাপারে কোনরকম আপোষ করতে রাজী নয়। রসালুর কাহিনীও তার অনমনীয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের তীব্র গতিবেগের কাহিনী। মধ্যযুগের সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে পাঞ্জাবী নায়ক-নায়িকাদের স্বভাব বোধ হয় সব থেকে বেশি অসাধারণ। পারিবারিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে এমন তীব্র বিরোধ আর কোথাও দেখা যায় না। সমাজ এক অত্যন্ত বলবান কিন্তু নিরকার ঔচিত্যবোধের প্রতীক। আমাদের কাহিনীতে অস্পষ্ট সমাজ-বিরোধিতার কোন স্থান নেই। কাহিনীগুলি জনজীবনের খুবই পরিচিত বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত এবং কবিরাও সমাজের অত্যন্ত

ঘনিষ্ঠ ও স্পষ্ট ঘটনাবলীকে রচনার প্রতিপাদ্য বিষয় করেছে। সমাজের সব থেকে প্রবল আর দৃশ্যমান অঙ্গ হল পরিবার। মধ্যযুগীয় পাঞ্জাবী রচনাবলীতে তার তৎকালীন চিত্রটি আপোষহীনভাবে পেশ করা হয়েছে। সব থেকে স্মরণযোগ্য বিষয় হল যে, কোন কাহিনীর নায়ক-নায়িকা তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি আন্তরিক থাকলেও কখনো কোথাও সংযমের সীমা ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেনি। হীর নিজে প্রচণ্ড সংগ্রাম করে রাঞ্ঝাকে লাভ করে। কিন্তু তারপরেও তার নিজের মা-বাবার সম্মতি ও স্বীকৃতি পেতে চায় এবং তাদের অধীনে থেকেই নিজের নতুন জীবন আরম্ভ করতে চায়। পুন্নূর চলে যাবার পরই সস্সী তার সন্ধানে ঘর ছাড়ে। সোহনী তার প্রথম প্রেমের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করে কিন্তু সামাজিক রীতিতে আবদ্ধ বিয়ের বন্ধনকে সে ভাঙতে পারে না। পূরনের মনে তার বাবা-মার প্রতি স্নেহ-প্রীতির অনুভাবনা দেখা যায় এবং শেষ পর্যন্ত সে তার সৎ-মাকেও বর দেবার জন্যে নিজের গ্রামে ফিরে আসে। এই সব কাহিনী থেকে এমন অনেক বিবরণ পাওয়া যায় যা থেকে বোঝা যায়, পাঞ্জাবী চালচলন তার ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সামাজিক সংযমের পরিধির মধ্যেই রাখতে চায়। কিন্তু সেই সংযম যখনই প্রতিবন্ধক হিসেবে ব্যক্তি-স্বাধীনতার গলা টিপে ধরতে চেয়েছে তখনই সে তীব্র বিরোধিতা করতে দ্বিধা করেনি। স্বাধীনতার যেমন স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার নেই তেমনি সংযমেরও প্রতিবন্ধকতার ভূমিকা গ্রহণের কোন অধিকার নেই।

পাঞ্জাবী জনমানস এই কাহিনীগুলিকে যতটা ভালবাসে, অন্য কোন কাব্য-কাহিনীর ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। মধ্যযুগের পাঞ্জাবী সাহিত্যের কিছু ভাবধারা এক বৃহৎ লোকসমাজের ধর্ম হয়ে উঠেছে। আমাদের মনের গভীর অন্তর্লোকেও তা পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু তবুও তা সমগ্র পাঞ্জাবী জনসাধারণের কাছে সমান স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। পাঞ্জাবী লোককথার অবয়ব এবং আত্মা ধর্মের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এ এমন এক নিজস্ব ধরণের লোকধর্ম যা কোন সংস্থা বা দলীয় প্রভুত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত। মোটামুটি ভাবে পাঞ্জাবী আচার-আচরণে এই লোকধর্মের প্রভাব দেখা যায়। সহজ কথায় যার অর্থ হল, পাঞ্জাবীরা যেখানে জন্মেছে, বড় হয়েছে—সেখানকারই রীতি রেওয়াজ নিজের করে নিয়েছে। কিন্তু তার নিজের অন্তরের সত্যকেও নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে আবার অন্তরের সত্যকে যেমন বল্গাহীন হতে দেয়নি, তেমনি বাইরের সত্যকেও অঙ্গের ভূষণ হিসেবে আঁকড়ে ধরেনি। ন্যায়ের মধ্যপথই পাঞ্জাবী আচরণের এবং পাঞ্জাবী লোককথার পথ। দৈনন্দিন জীবনেও আমাদের এই পথ অবলম্বন করেই চলা সম্ভব।

সংক্ষেপে বলা চলে—সরলতা, ন্যায় আচরণ, স্বাধীনতা এবং সংযমের সম্মিলিত পরিবেশই পাঞ্জাবী লোককথার জগত।

—হরভজন সিং

সূচীপত্র

ভূমিকা/v

হীর রাঞ্ঝা/মোহন সিং/1

মিরজা সাহিবান/গুরুবক্স সিং/15

সস্‌সী পুন্নূ/অমৃতা প্রীতম/28

সোহনী মহীওয়াল/কর্তার সিং দুগ্‌গল/37

পূরন ভগত/শিবকুমার/47

রাজা রসালু/হরভজন সিং/53

দুল্লা ভট্টী/বলবন্ত গার্গী/68

জীউণা মোড়/দলীপ কৌর টিবানা//73

কৈমা মলকী/গুলজার সিং সন্ধু/82

মোহন সিং

হীর রাঞ্ঝা

হীরের কাহিনীটি মোঘলদের ভারতবর্ষে আগমনের কিছুকাল আগের ঘটনা। রাজপুতরা সে সময়ে সবে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। সিয়ালরা বীরনগরের রাজপুত। রায় শঙ্করের ছেলে রায় সিয়াল 1258 সালে বাবা ফরীদ শকরগঞ্জের কাছে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নেয়। অবশ্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তারা হিন্দু রীতিনীতির অনেক কিছুই মেনে চলত। স্ত্রীলোকদের তারা পর্দানসীন করে রাখেনি। তুর্কীদের মত নীল কাপড় পরা বা পেতলের বাসনপত্র ব্যবহার করত না তারা। সিয়ালদের পূর্বপুরুষ মলখান 1462 সালে সর্বপ্রথম এ অঞ্চলে এসে ঝংগ শহরের পত্তন করে। সে সময়ে সিয়ালদের সর্দার ছিল চূচক। হীর এই নবাব চূচকের মেয়ে। নবাবের ঘরের আদর যত্নে সে মানুষ হয়েছে। সাথীদের সাথে দোলনায় দোলা, চিনাব (চন্দ্রভগা) নদীতে চান করা, অথবা ফুলমালায় সাজানো তার নৌকায় চড়ে নদীর ঘাটে এসে আকাশে সঘন মেঘের মেলা দেখা আর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে নদীর জলে রঙের খেলা দেখাই ছিল তার কাজ। যুবতী হীর ছিল যেমন তন্বী স্বাস্থ্যবতী চঞ্চল আর নির্ভীক তেমনি ছিল তার অনিন্দ্যসুন্দর রূপলাবণ্য। রূপ আর যৌবনের এমন মিলন বড় একটা দেখা যায় না—তার চলনে একদিকে যেমন হাতীর নবাবী মেজাজ তেমনি ক্ষিপ্রতায় আবার ঈগলের স্বচ্ছন্দ গতি। ভারতীয় ধারার সঙ্গে তুলনা করলে সে একাধারে 'মোহিনী আর ইন্দ্রানী' এবং ইরানী ধারায় বলতে গেলে বলতে হয় সে ছিল 'পুতলী, পীকনে দী নকৃশ রূম বালে, গুঝ্‌ঝী রহে ন হীর হজার বিচ্চোঁ'।[1]

ঝংগের জমিদারী ছাড়াও চিনাব নদীর পারঘাটার দেখাশোনা করার ভার ছিল চূচকের হাতে। যাত্রী পারাপারের জন্যে ঘাটে সর্বদাই কিছু নৌকা থাকত। নদীর ঘাটে পথিক আর ব্যবসায়ীরা সারাদিনই ভীড় করত। সব যাত্রীরই প্রথমে নজর পড়ত হীরের নৌকার ওপরে। হীরের নৌকার মাঝি লুড্ডন নৌকাটাকে

1. চীনেদের কটা চোখের তারা, তুর্কীদের মত উন্নত দেহের গড়ন, হীরকে হাজার রূপসীর মধ্যে লুকিয়ে রাখলেও সহজে চোখে পড়ে।

খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতো। সেই শূন্য নৌকাটা দেখেই অনেকে কল্পনার জাল বুনতো মনে মনে আর যারা বরাত গুণে হীরের দেখা পেয়ে যেত তাদের তো রূপের নেশায় মাতাল হবার যোগাড়! এমনি করেই পথিক আর সওদাগরদের মুখে মুখে হীরের রূপ যৌবনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দূর দূরান্তে।

ঝংগ থেকে প্রায় মাইল আশী দূরে এক গ্রাম তক্ত হাজারা। হীরের রূপের কথা একদিন সেখানেও গিয়ে পৌঁছয়। সেখানকার যুবকযুবতীরা সকলেই হীরের নামের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে। তক্ত হাজারার গ্রামের মোড়লের নাম মৌজু, জাতে সে রাঞ্ঝা জাঠ। তার আট ছেলে। ছেলেদের মধ্যে ধীদো সকলের ছোট, সব থেকে কোমল স্বভাবের এবং সুদর্শন। বাবার মৃত্যুর পর জমি জায়গা ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় বড় ভাইয়েরা সব ভাল জমি গুছিয়ে নিয়ে ধীদোকে খানিকটা অজন্মা পতিত জমি ধরে দেয়। ধীদো (রাঞ্ঝা) বাপের আদুরে ছেলে ছিল, কোনদিন তাকে ক্ষেতের কাজ করতে হয়নি, তাই জমি পেয়ে সে চাষ আবাদের দিকে না গিয়ে আগের মতই ফুলবাবু সেজে ঘুরে বেড়াতে থাকে। রাঞ্ঝার বৌদিরা সকলেই তাকে খুব ভালবাসতো। কিন্তু কিছুদিন তারা আদর যত্ন করার পর যখন দেখলে সে শুধু বাবু সেজে বাঁশি বাজান ছাড়া আর কোন কাজের নয় তখন তারা তাকে খোঁটা দিয়ে কথা শোনাতে সুরু করে। রাঞ্ঝা যদি বৌদিদের এই আদর যত্নের সামান্যতম প্রতিবাদের চেষ্টা করতো তাহলে তাকে কোনদিনই কথা শুনতে হত না—কিন্তু তার স্বভাব কিছুটা খামখেয়ালী ধরণের। তার তারুণ্যের মধ্যে একটা বেপরোয়া অনমনীয়তা ছিল। একদিন তার ছোট বৌদি তাকে ঠাট্টা করে বলে—'তোর যখন আমাদের জন্যে আর কোন চিন্তা ভাবনা নেই তো যা তাহলে, সিয়ালের হীরকে বিয়ে করে নিয়ে আয়।' বৌদির এই বিদ্রূপ রাঞ্ঝার মনে বড় লাগে—হাতে বাঁশি আর বগলে জুতো নিয়ে সে একদিন কবি বারিশাহের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। প্রথম রাতটা মসজিদে কাটায়—কিন্তু মৌলবীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ায় ভোর বেলাই সেখান থেকে রওনা দেয়। বহু গ্রাম ঘুরে শেষে চিনাব নদীর তীরে এসে উপস্থিত হল সে। ঘাটে সে সময় হীরের নৌকা ছাড়বার জন্য লুড্ডন তৈরী হচ্ছিল। আল্লার নামে মিনতি করে রাঞ্ঝা তাকে ওপারে পৌঁছে দেবার জন্যে অনুরোধ করে। কিন্তু বদমেজাজী মাঝি রাঞ্ঝাকে ধাক্কা মেরে ঠেলে ফেলে দিয়ে নৌকা ছেড়ে দেয়। লুড্ডনের মেয়ে বৌয়েরা কিন্তু রাঞ্ঝার রূপ দেখে তার চারপাশে জড়ো হয়ে তোষামোদ করতে শুরু করে। একটু সুস্থ হবার পর রাঞ্ঝা তার বাঁশিতে সুর তোলে। দেখতে দেখতে আশপাশের ঘাটের সব পুরুষ মহিলারা এসে ভিড় করে। লুড্ডনের বৌয়েরা রাঞ্ঝার রূপে এমন মোহিত হয়ে পড়ে যে তারা শেষ পর্যন্ত রাঞ্ঝাকে হীরের নৌকায় নিয়ে গিয়ে তোলে। বজরায় রেশমের পর্দা ঘেরা কামরায় হীরের বিছানা পাতা ছিল। অনেকটা পথ সফর করে এসেছিল রাঞ্ঝা, বিছানায় শুতে না শুতেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। এদিকে হীরের কাছে খবর পৌঁছল, যে তার বিছানাতে লুড্ডন এক অচেনা বিদেশীকে শুতে

দিয়েছে। সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার সখীদের সাথে ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত। প্রথমেই তো লুড্ডনকে ছড়ি দিয়ে মারতে মারতে রক্তারক্তি কাণ্ড বাঁধালে সে। তারপর এক লাফে নৌকায় উঠে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। নিজের বিছানায় এক অচেনা বিদেশীকে শুয়ে থাকতে দেখে রাগের মাথায় তাকেও ছড়ি দিয়ে এক ঘা লাগাতেই রাঞ্ঝা উঠে পড়ে বলে—'সাবাস প্রিয়তমা।' আর সেকথা শুনেই হীরের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, সে রাগ ভুলে যায়। হীরের চোখের তারায় এক নতুন দীপ্তি ফুটে ওঠে। সে পর্দা টেনে দিয়ে রাঞ্ঝার পাশে খাটের বাজুতে গিয়ে বসে। তারপর কতক্ষণ যে তাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ চলেছিল তার আর কেউ খোঁজ রাখেনি। শেষে হীর রাঞ্ঝাকে তার প্রেম নিবেদন করতে রাঞ্ঝা বলে—'কিন্তু তুমি যদি তোমার সখীদের সঙ্গে চরখায় সূতো কাটার আড্ডায় কিংবা দোলনা ঝোলার মত্ততায় আমাকে আবার ভুলে যাও তো এখনই না হয় সে কথা ভেবে দেখে বলে দাও'। হীর শান্ত গম্ভীর স্বরে জানায় ঃ

মৈনূ্ঁ বাবলে দী কসম র্াঁঝিয়া ওয়ে,
মর জাঁউঁ জে তুধ থী্ঁ মুখ মোড়াঁ।
অন্নী্ঁ হোয়ে কে নয়ন প্রাণ জাওণ,
তেরে বাঝ জো কান্ত মৈঁ হোর লোড়াঁ।
মৈঁ তাঁ ধুর দরগাহ থী্ঁ লিয়া র্াঁঝা,
থীমা সূর জে প্রীত দী রীত তোড়াঁ।[1]

নিজেদের মন বোঝাবুঝির পালা এভাবে শেষ হবার পর হীর অনেক ফন্দি-ফিকির খাটিয়ে রাঞ্ঝাকে তাদের গরু মোষ চরাবার রাখালের কাজে লাগাবার জন্যে বাবা-মাকে রাজী করাল। চূচক প্রথমটায় ঘোরতর আপত্তি করেছিল। এমন সুন্দর চেহারার কোমল স্বভাবের ছেলেকে দিয়ে মোষ চরানোর কাজ ঠিকমত হবে না। বলেছিল, 'এতো আমাদের মোষেদের অন্যের পালের সঙ্গে মিশিয়ে গোলমাল করে ফেলবে। জঙ্গলে বুনো জন্তু-জানোয়ারেরা দিনদুপুরে ঘুরে বেড়ায়, সেসব ঝামেলা ঝক্কি এ সামলাতে পারবে না।' কিন্তু হীর তার বাবাকে শেষ পর্যন্ত এই বলে রাজী করালে ঃ

বড়া চতর ভে অকলাঁ দা কোঠ নঢ্ঢা,
মঁঝী্ঁ বহুত সঁভাল কে চারদা য়ে।

1. রাঞ্ঝা, আমি আমার বাবার নামে শপথ নিয়ে বলছি আমি যদি কখনো তোমাকে বিমুখ করি তো আমার মা যেন মারা যায়। যদি আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে পতি হিসেবে কামনা করি তো যেন অন্ধ হয়ে মারা যাই। আমার রাঞ্ঝাকে আমি পীরের দরগা থেকে মানত হিসেবে পেয়েছি, এই প্রেমের বন্ধনকে ছিন্ন করলে আমি যেন শূকরী হয়ে যাই।

ছিকে নাল পিয়ার দে ঢুংগ দেকে ;
সোটা সিংগ তে মূল না মারদা য়ে ।[1]

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল রাঞ্ঝা পরবর্তী বারো বছর সিয়ালের দেশে রাখাল হয়েই রয়ে গিয়েছে। সে রোজ সকালে মোষদের নদীর তীরে জঙ্গলের ধারে নিয়ে যেত আর বিকেলে তার বাঁশির শব্দে তারা ঘরে ফিরে আসতো। হীর রোজ রাঞ্ঝার জন্যে পাত্র ভরে চুরমা (ঘি, ময়দা ও চিনি দিয়ে তৈরী এক ধরণের মিষ্টি) নিয়ে জঙ্গলের ধারে যেত। তারা দুজনে একসঙ্গে বসে চুরমা খেত এবং অন্ধকার ছায়াচ্ছন্ন নিবিড় জঙ্গলের পথে প্রান্তরে প্রেমের নিভৃত রাজ্যে সেই দুই প্রেমিক প্রেমিকাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। তারা দুজনে অপার আনন্দে নদীর গাঢ় নীল জলে ঢেউয়ের খেলা দেখত। কিন্তু প্রেম এবং কস্তুরীর খবর খুব বেশিদিন চাপা থাকে না। অচিরেই সারা মহল্লা হীর-রাঞ্ঝার প্রেমের আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। যত মুখ তত গুঞ্জন। হীর আর রাঞ্ঝাকে বিধাতা যেন পরস্পরের জন্যেই তৈরী করেছিলেন, তাদের দুজনকে এমন সুন্দর মানিয়ে ছিল, যে কেউ তাদের মেলামেশায় কোন দোষ দেখে না বরং সকলেই ব্যাপারটাকে চাপা দেবার, আড়াল করার চেষ্টা করে।

কিন্তু এই প্রেমের নাটকে একদিন এক উপদ্রবকারীর প্রবেশ ঘটল। সে হীরের কাকা খোঁড়া কৈদো। তার চেহারা বিচিত্র ধরণের—মাথায় মাদারীদের মত টুপি, গলায় কুশের মালা, হাতে মাটির মালসা, নেশা-ভাঙে সিদ্ধপুরুষ। গাঁয়ের বাইরে এক কুঁড়ে ঘরে সে থাকতো। টিয়া, তিতির, হাঁস-মুর্গী পোষার শখ ছিল তাঁর। আসলে সে আধা-সংসারী, আধা-ফকির। চণ্ডুর আড্ডায় আর ফকিরদের আস্তানায় আফিম-সিদ্ধি খেয়েই সে তার জীবনের প্রায় সবগুলো বছর কাটিয়ে দিয়েছে। ফকিরদের মতই তার জীবন নিঃসঙ্গ ও একাকী। প্রেম-ভালবাসার এমন ঘনঘটা দেখে সে যে হিংসেয় জ্বলতে থাকবে এ তো খুবই স্বাভাবিক। হীর আর তার সখীদের রাঞ্ঝার সঙ্গে বসে চুরমা খাওয়া আর জঙ্গলে সকলের লুকোচুরি খেলা সে মেনে নিতে পারে না। একদিন সে হীরের পিছু ধাওয়া করে জঙ্গলের ধারে এসে উপস্থিত হল। হীর নদীতে জল আনতে গেলে রাঞ্ঝা একা বসে চুরমা খেতে থাকে। কৈদো খুবই কাকুতি-মিনতি করে রাঞ্ঝার কাছে একটু চুরমা ভিক্ষে চাইলে। রাঞ্ঝা খাবারের পাত্রটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—'নিয়ে নাও।' কৈদো মুঠো করে খানিকটা চুরমা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গ্রামের দিকে ছোটে। জল নিয়ে ফিরে এসে হীর সবকিছু শুনে রাঞ্ঝার এই ভালমানুষী দেখানোর জন্যে তাকে খুব খানিকটা বকা-ঝকা করলে। কারণ, সে জানতো ল্যাংড়া কৈদো গ্রামে গিয়ে হৈ চৈ বাঁধাবে খানিকটা। কৈদো গ্রামে পৌঁছবার আগেই মাঝ পথে হীর তাকে গিয়ে

1. এই ছেলেটি খুবই হুঁশিয়ার, এবং বুদ্ধির কোন সীমা নেই। খুবই সাবধানে সে মোষেদের চরাবে। তাদের সে আদর যত্ন করবে। অন্য রাখালদের মত তাদের শিংয়ে লাঠি মারবে না।

ধরে এবং তার গলার কুশের মালা আর টুপি টান মেরে ফেলে দিয়ে তাকে বেশ খানিকটা নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। সমস্ত চুরমা রাস্তায় পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। কিন্তু হীর চলে যেতেই কৈদো পথ থেকে চুরমার দানা খুঁটে খুঁটে তুলে গ্রামে গিয়ে সোরগোল শুরু করে। চূচক আর মালকী তাতে লজ্জায় পড়ে। হীরের ভাই তলোয়ার ঘুরিয়ে হুমকি দেয়—'বেটা চাকরটাকে আমি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো।' তারা সকলে গালিগালাজ দিতে দিতে রাঞ্ঝাকে প্রায় গলা ধাক্কা দিয়ে গ্রাম থেকে বার করে দিল। হীর কিন্তু সে অবস্থাতেও হার মানে না বরং বেশ সাহসের সঙ্গেই ভাই সুলতানকে বলে :

অকৃখাঁ লগ্‌গীয়াঁ মুড়ন ন বীর মেয়ে,
ওয়ে মৈঁ ঘোল ঘত্তী বলিহারিয়াঁ ওয়ে।
বহন পয়ে দরিয়া না কদী রুকদে,
ভাবেঁ মার দেখো বন্‌হাঁ ভারিয়াঁ ওয়ে।
খুন নিকলনেঁ কদী না রুকদা য়ে
জিথে লগীয়াঁ তেজ কটারিয়াঁ ওয়ে।...[1]

তার বারো বছরের চেষ্টা এভাবে পণ্ডশ্রম হতে দেখে রাঞ্ঝা মনের দুঃখে ফকিরদের এক আস্তানায় গিয়ে মাথা গোঁজে কিন্তু পরের দিন গরু মোষেদের জঙ্গলের ধারে চরাতে নিয়ে যেতে গিয়ে দেখা গেল, তারা রাঞ্ঝা ছাড়া এক পাও নড়তে রাজী নয়। জাবের পাত্রের সামনে বাঁধতেও তারা জাবে মুখ পর্যন্ত লাগায় না। শেষে আর কোন উপায় না দেখে চূচক ও মালকী কূটনীতির আশ্রয় নিল, তারা খাতির যত্ন করে রাঞ্ঝাকে ফিরিয়ে এনে মোষেদের চরাতে পাঠাল এবং হীরকে বোঝাল যে অমন বদনামের পর তার আর জঙ্গলে যাওয়া ঠিক হবে না। মনে মনে তারা ঠিক করে রাখে যে হীরের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে পারলে চাকরের সঙ্গে এই কেলেঙ্কারীর হাত থেকে আপনা থেকেই নিস্কৃতি পাওয়া যাবে। কিন্তু গাঁয়ের লোকেদের সহানুভূতি হীর-রাঞ্ঝার সপক্ষে ছিল। আর হীর অত্যন্ত চালাক মেয়ে। শিগগিরই সে মিট্ঠী নামে এক নাপিত বৌ-এর বাড়ীতে তাদের দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা ঠিক করে। রাঞ্ঝা এখন মোষেদের জঙ্গল ছেড়ে নাপিত বৌ-এর বাড়ী চলে আসে এবং সেখানে মনের সুখে দুজনে প্রাণ ভরে গল্পগুজব করে কাটায়। কখনো কখনো তারা নদীতে চান করতেও যেত। হীর তার সখীদের নিয়ে রাঞ্ঝার সাথে একসঙ্গে চান করতো।

1. শোনো ভাই, একবার দুচোখের মিলন হলে তাকে আর ফেরানো যায় না—আমি আমার প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ; যতই লম্বা-চওড়া বাঁধ দাও না কেন নদীর স্রোতের ধারাকে আটকানো সম্ভব নয়। ধারালো অস্ত্র শরীরে বিঁধলে রক্তপাত হবেই, তাকে কেউ থামাতে পারে না।

য়েস তখ্‌ত হজারে দে ডম্বরে তে,
রঙ্গ রঙ্গ দিয়্ঁা জালীয়্ঁা পান্‌দী হ্যায় ॥[1]

কিন্তু তাদের এই মেলামেশার কথা ক্রমশঃ চারধারে ছড়িয়ে পড়তে থাকায় শেষপর্যন্ত খেড়ের সঙ্গে হীরের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করে ফেলা হল। কিছুদিনের মধ্যেই বরযাত্রীর দলবল নিয়ে খেড়ে বেশ ধূমধামের সঙ্গে রঙ্গপুর থেকে ঝংগ-এ এসে উপস্থিত হল। হরেক রকম কালিয়া পোলাও আর আতসবাজী পোড়ানোর আয়োজনে সারা গাঁ যেন উৎসবে মেতে ওঠে—সেই জ্ঁাকজমক দেখে রাঞ্ঝার খুবই মন খারাপ হয়ে যায়। তাকে উদাস এবং বিমর্ষ দেখাতে থাকে। কখনো সে নদীর তীরে বসে সিদ্ধি খায় আবার কখনো মোষেদের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদে। হীরের কোন বান্ধবী তাকে ডেকে কিছু বলতে গেলে কথায় কথায় সে কেঁদে ভাসাতে থাকে। ওদিকে হীর তখন বিয়ের নানান আচার অনুষ্ঠানের ফেরে আটকা পড়ে গিয়েছে। রাঞ্ঝার মানসিক কষ্ট সে অনুভব করতে পারে। সে তার সখীদের ডেকে বলে—'যাবার আগে রাঞ্ঝাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। ওকে মেয়েদের পোষাক পরিয়ে লুকিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো একবার।' সেদিন রাত গভীর হতে হীরের মাসী-পিসীরা তার কাছ থেকে উঠে যাবার পর যখন তার সখীরা কেবল থাকে সে সময়ে মেয়েদের পোষাকে রাঞ্ঝা হীরের সঙ্গে দেখা করতে এল। কিছুটা মেয়েদের পোষাক পরার জন্যে এবং কিছুটা উদাস বিষন্নতার জন্যে রাঞ্ঝাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল। হীর রাঞ্ঝাকে বলে, 'যা বলছিলাম, আমাকে এখনই তুমি এখান থেকে নিয়ে পালিয়ে চল, কাল আমার বাবা মা আমাকে পাল্কীতে একবার তুলে দিলে তখন আর কারুর কোন কথা খাটবে না।' কিন্তু রাঞ্ঝা চেয়েছিল সে আর পাঁচজনের মতই হীরকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। তাই সে বলে:

হীরে ইশ্‌ক না মূল স্বাদ দেন্‌দা,
নাল চোরিয়্ঁা অতে উধালিয়্ঁা দে।[2]

হীর তাকে অনেক করে বোঝায় কিন্তু রাঞ্ঝা পালিয়ে যাবার কথা মানতে পারে না, সে তার নিজের জেদ ধরে থাকে। পরের দিন খেড়ে হীরকে পাল্কীতে বসিয়ে রংপুরে ফেরার জন্যে তৈরী হয়। হীরের বাবা বিয়েতে বরপণ হিসেবে অনেক কাপড়-চোপড় গহনা আর সেই সঙ্গে কয়েকটা গরু মোষও দেয়। কিন্তু গোলমাল বাঁধল গরু মোষ নিয়ে, তারা রাঞ্ঝাকে ছাড়া এক পা নড়তে রাজী নয়। সবরকম চেষ্টা করে বিফল হয়ে শেষে রাঞ্ঝাকেও সঙ্গে পাঠাতে হল। ঝংগ থেকে রংপুরের দূরত্ব প্রায় সত্তর মাইলের মত। খেড়ে পথে নানান জায়গায় তাঁবু ফেলে বিশ্রাম আর শিকার করতে করতে যেতে থাকে। রাঞ্ঝা হীরের পাল্কী থেকে কিছু

1. তখ্‌ত হাজারার সেই ভালোমানুষ ছেলেটি ক্রমশঃ নানান বর্ণালী বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে থাকে।

2. হীর, এভাবে তোমাকে লুকিয়ে চুরিয়ে নিয়ে গেলে প্রেমের কোন আনন্দই আর থাকবে না।

দূরে হীরের সিন্দুক নিয়ে হেঁটে চলছিল। হীর তার গলার মুক্তোর মালাটা ছিঁড়ে পাল্কীর বাইরে সব মুক্ত ছড়িয়ে দিয়ে ইশারায় রাঞ্ঝাকে মুক্তোগুলো কুড়োতে বলে। রাঞ্ঝা মুক্তোগুলো সব কুড়িয়ে দুহাত ভরে হীরকে দেবার সময় তার দুচোখে মুক্তোর মত টলটলে অশ্রুবিন্দু দেখে হীর বলে ঃ

> লৈ বে রাঁঝিয়া জোর মৈঁ লা থকী,
> মেরে বস থী গল বেবস হোঈ।
> ফড় কে মাঁ পিয়াঁ, কাজীআঁ বন্ন তোরী,
> সাডে নাল কেডী খরখস হোঈ।
> জিউঁদে রহে তাঁ মিলাঁগে ফের বেলী,
> হাল সাল তাঁ দোস্তী বস হোঈ।[1]

কিন্তু এই নিরাশা ও বিষণ্ণ ভাবটা কিছুটা কাটিয়ে ওঠার পর হীর একসময় আবার রাঞ্ঝাকে বলে—'তুমি কিছু চিন্তা কোরো না, আমি খেড়েকে কোনদিনই স্বামী হিসেবে মেনে নেবো না। তুমি খুব শিগগির সাধুর বেশ ধরে রংপুর চলে এসো। আমার কথা আগে না শুনে তুমিই বিপদ ডেকে এনেছো। এবারে কিন্তু আবার যেন দেরি করে সময় নষ্ট কোরো না।'

2

খেড়ে তার দলবল দিয়ে রংপুরে এসে পৌঁছয়। বরের বাবা অজ্জু খুব ধুমধাম সহকারে তাদের স্বাগত জানালে। হীরের রূপের খ্যাতি আগেই সকলে শুনেছিল, তাকে দেখার জন্যে তাই গাঁয়ের সবাই ভীড় করে আসে। কিন্তু তেমনভাবে দেখার চোখ থাকলে দেখতে পেত হীরের সেই রূপের চ্ছটায় আনন্দের কোন প্রকাশ ছিল না বরং দুঃখের এক সূক্ষ্ম অস্পষ্ট রেখার আভাষ ফুটেছিল। তার ননদ সৈতী সকলের প্রথম দুঃখের সেই রেখাটিকে দেখতে পায়। বাইরে থেকে সৈতীকে খুব চঞ্চল আর ছটফটে স্বভাবের মেয়ে বলে মনে হলেও তার অন্তরে দুঃখের বিষম এক বোঝা ভার হয়ে চেপেছিল। মুরাদ বলোচ নামে এক প্রেমিকের পঞ্চশরে সে সে সময়ে রীতিমত আহত। প্রেমের ব্যাপারে একই পরিস্থিতির মধ্যে তারও দিন কাটছিল বলে সে হীরের দুঃখের ভাগ নিতে এগিয়ে আসে। সৈদে খেড়ে হীরকে কথা বলানোর অনেক চেষ্টা করে কিন্তু হীর তো প্রথম থেকেই রাঞ্ঝার গচ্ছিত ধন, মনে প্রাণে। অন্য কয়েকজন কাহিনীকারের লেখা থেকে জানা যায়, সৈদা যখনই

1. হে রাঞ্ঝা, আমি আমার সমস্ত জোর খাটিয়ে শেষে হায়রান হয়ে গেছি। এখন অবস্থা আমার হাতের বাইরে চলে গেছে। আমার বাবা-মা আর মৌলবীরা আমাকে জোর করে পাল্কীতে বসিয়ে দিয়ে আমার ওপর চরম অবিচার করেছে। হে প্রিয় বন্ধু, যদি বেঁচে থাকি তো আবার কোনদিন দেখা হবে—এখনকার মত আমাদের বন্ধুত্বের এখানেই শেষ।

হীরের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেছে অলক্ষ্যে পঞ্জ-পীর তাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ফলে তার মনে এমন এক আতঙ্কের উদয় হয়েছিল যে হীরের দিকে সে ফিরে তাকাতে পর্যন্ত সাহস করতো না।

বহুদিন পর্যন্ত হীর রাঞ্ঝার কোন খবর পায় না। তার বিষণ্নতা দিন দিন আরো বাড়তে থাকে। সে সারাদিনই বিছানায় শুয়ে কাটায়, ক্রমশ গাঁয়ে গুজব রটে গেল যে হীরকে কোন ভূতে ভর করেছে। ঝঙ্গ-সিয়ালের গাঁয়ের এক মেয়ের রংপুরে বিয়ে হয়েছিল তার বাপের বাড়ী যাবার সময় রাঞ্ঝার বহুদিন কোন খবর না পেয়ে হীর তার হাত দিয়ে তাগাদা পাঠালে বন্ধু প্রেমকে এভাবে মিথ্যে করে দিও না, তাড়াতাড়ি সন্ন্যাসী সেজে এখানে চলে এসো। হীরের সখীরাও রাঞ্ঝাকে উৎসাহ দিতে থাকায় শেষ পর্যন্ত সে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নিতে বালনাথের আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হল একদিন।

যুবক রাঞ্ঝার রূপ দেখে গুরু বালনাথ অবাক হয়ে গেলেন। আশ্রমে আরো অনেকেই সন্ন্যাসের দীক্ষা লাভের জন্যে বেশ কয়েকবছর ধরেই গুরুর সেবা করছিল। গুরু বালনাথ অবিলম্বে রাঞ্ঝাকে দীক্ষা দিতে রাজী হয়ে শিষ্যদের রাঞ্ঝার জন্যে কানের কুণ্ডল তৈরী করতে বলতে তারা ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে। কিন্তু সর্বজ্ঞ গুরু রাঞ্ঝার বর্তমান মানসিকতা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন প্রকৃত প্রেমের আগুনে দগ্ধ হয়ে রাঞ্ঝা ইতিমধ্যেই সন্ন্যাসের উচ্চমার্গে পৌঁছে গিয়েছে। সন্ন্যাসী তো সে আগে থেকেই ছিল, এখন কেবল তার সন্ন্যাসীর বাহ্যিক বেশভূষণের প্রয়োজন। তবু বালনাথ দীক্ষা দেবার আনুষ্ঠানিক যজ্ঞাসনে তাকে সন্ন্যাসের মূল মন্ত্রের ব্যাখ্যা করে বললেন—'নিজের থেকে বয়সে বড় সকল স্ত্রীলোককে মাতৃরূপে এবং ছোটদের ভগিনী জ্ঞান করবে।' কিন্তু রাঞ্ঝা গুরুকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে তার পক্ষে এ সর্ত স্বীকার করা সম্ভব নয় কারণ সে হীরকে পাওয়ার জন্যেই সন্ন্যাস গ্রহণ করতে এসেছে। একথা শুনে গুরু বালনাথের হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে, তিনি রাঞ্ঝাকে কুশের মালা, শিরস্ত্রাণ, বালা, কমণ্ডলু এবং ভেরী প্রভৃতি সন্ন্যাসের যাবতীয় উপাচার দিয়ে আশ্রম থেকে বিদায় জানান। রাঞ্ঝা তাঁর দৃষ্টিপথের বাইরে মিলিয়ে যেতেই সে দীক্ষা গ্রহণের সময় যে পাথরে বসেছিল সেই পাথরটিকে তিনি প্রণাম করলেন। যোগীর আশ্রমে সেই শিলাখণ্ডটি এখনও রাখা রয়েছে এবং দর্শনার্থী যাত্রীরা আজও সেটিকে প্রণাম করে।

সন্ন্যাসীর নতুন পোষাকে আশ্রম থেকে বিদায় নেবার পর রাঞ্ঝাকে আরো সুন্দর দেখতে লাগে—তার চেহারার দীপ্তিতে চোখ যেন ঝলসে যায়। নানান দেশ গ্রাম ঘুরে রাঞ্ঝা একদিন রংপুরে এসে পৌঁছয়। পথে এক রাখালের সঙ্গে তার দেখা—সে রাঞ্ঝাকে তৎক্ষণাৎ চিনতে পারে। রাঞ্ঝা প্রথমে সে কথায় বিশেষ আমল দেয় না কিন্তু রাখালের মুখে তার নিজের প্রেম কাহিনীর আদ্যপান্ত শুনে সে অবাক হয়ে যায়। সে ভাবতে থাকে কেমন করে তার প্রেমের কাহিনী এখানে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে! সে রাখালের কাছে রংপুরের ভাল করে খোঁজ-

খবর নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। জল খাবার জন্যে গাঁয়ের কুয়ার কাছে যেতে তার রূপ দেখে গাঁয়ের যুবতীরা যারা জল নিতে এসেছে তারা মোহিত হয়ে যায় এবং দেখতে দেখতে বিবাহিত অবিবাহিত মেয়ে বৌয়েরা সবাই তাকে ঘিরে ধরে। সেই দলে হীরের ননদ সৈতীও ছিল।

ঘর আকে ননান নে গল্ল কীতী,
ভাবী এক জোগী নবাঁ আয়া নী,
কন্নী উসদে দরশনী মুঁদরা নে,
গল হৈঁকলা অজব সুহায়া নী।
ফিরে ভটকদা বিচ্চ হবেলিয়াঁ দে,
কোঈ উসনে লাল বঁঝায়া নী।[1]

সৈতীর কথা শুনেই হীরের হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়। সে ভাবে, তাহলে বোধহয় রাঞ্ঝাই যোগী সেজে এসে গিয়েছে। তার বুকের মধ্যে তোলপাড় হতে থাকে—তার দেহের প্রতি রোমকূপ রাঞ্ঝার মিলন প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে ওঠে। সৈয়দ বারিসশাহ হীরের সে সময়কার মানসিক অবস্থাটি বড় কোমল এবং করুণ শব্দে গেঁথেছেন:

মুট্ঠী মুট্ঠী য়ে গল্ল না করো ভৈনা,
মৈঁ তে সুণদেয়াঁ হী রুড় গঈ জে নী।
তুসাঁ য়ে জদোকণী গল্ল কীতী,
মেরে ধুর কলেজড়ে পঈ জে নী।
ফিরে পোস্ত, ধতূরা তে ভঙ্গ পীন্দা,
মৌত উসনে মুল্ল কিউঁ লঈ জে নী।
জিস মাউঁ দা পুত্ত ফকীর হোয়া,
দিত্তা রব্ব দা ওই সহ গঈ জে নী;
জিসদে ভিন্নড়ে য়ার দে কন্ন পাটে,
ওহ তাঁ ন ঢঢড়ী চৌড় হো গঈ জেনী।[2]

কিন্তু এ সবই হীরের অনুমান মাত্র। সে কেবলই ভাবতে থাকে—ভগবান, এই যোগী যেন রাঞ্ঝা না হয়—তাহলে তো আমার আর কোন উপায়ই থাকবে না। সৈতীও তখনো পর্যন্ত বুঝতে পারেনি যে সেই রাঞ্ঝা। পরের দিন রাঞ্ঝা খেড়ের

---

1. বাড়ী ফিরে এসে ননদ বলে, 'বৌদি, এক নতুন যোগী এসেছে—তার কানে মাকড়ি আর গলায় মালা। সে বাড়ী বাড়ী এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন কোন দুর্মূল্য মণিমাণিক্য হারিয়ে গেছে তার।

2. বোন, এমন প্রলোভনের কথা আমায় শুনিয়ো না। ওকথা শুনেই আমি শেষ হয়ে গেছি। যখনই তুমি কথাটি শোনালে তা আমার মরমে গিয়ে আঘাত করেছে। যোগী আফিং, ধুতুরা আর সিদ্ধি খেয়ে এভাবে কোন মৃত্যুকে বরণ করতে চলেছে? যার ছেলে এখন সন্ন্যাস নিয়েছে সে মা কেমন করে এই বিধান সহ্য করছে? যার এমন রূপবান প্রেমিক যোগী হয়ে গেল সে মেয়ের জীবন মিথ্যে হয়ে গেছে জানবে।

বাড়ীতে ভিক্ষে চাইতে এলে সৈতীর সঙ্গে তার বেশ খানিকটা কথা কাটাকাটি হল। হীর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনছিল। সৈতী এক সময় রাঞ্ঝাকে বলে, 'তুমি যদি সত্যিই যোগী পুরুষ তো তাহলে বলো আমার বৌদির অসুখটা কি?' রাঞ্ঝা তখন হীরা এবং চাকার গল্পটা বলতে শুরু করে এবং কথা প্রসঙ্গে সৈতী আর মুরাদের প্রেমের ব্যাপারেও ইঙ্গিত করে। সে কথা শুনে সৈতী কিছুটা নরম হলেও সে কপট রাগের ভাব দেখিয়ে ঝিকে ডেকে বলে—'একে ভিক্ষে দিয়ে আপদ বিদেয় কর।' রায়বা এক মুঠো চাল এনে দেবার সময় রাঞ্ঝা হাতের পাত্রটা ছেড়ে দেয়। সমস্ত চাল উঠোনে ছড়িয়ে পড়ে। হীরের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তৈরী করার জন্যেই রাঞ্ঝার এ কাজ। হীর যোগীর দিকে ফিরে তাকাতেই সামনে রাঞ্ঝাকে দেখে তাঁর প্রেম নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে। সৈতীর কাছে সে তার হৃদয়ের সমস্ত অর্গল খুলে দেয় আজ—কোন কথাই গোপন রাখে না। এরপর থেকে ননদ আর বৌদি দুজনে মিলে তাদের প্রেমকে সফল করে তোলার উপায় খুঁজতে থাকে।

রাঞ্ঝা শ্মশানে তাঁর আস্তানা পাতে। সে প্রকৃত সন্ন্যাসীদের মত কখনো খুব শান্ত দরদীভাবে দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথা বলে আবার কখনো কখনো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কারুর হয়তো মনোবাঞ্ছা পুরণ করে আবার কাউকে চিমটে নিয়ে তেড়ে যায়। হাজার হাজার মেয়ে বৌ তাদের মনের দুঃখের কথা তাকে জানিয়ে তার হাত থেকে মুক্তির উপায় জানতে চায়। শেষে একদিন হীরও তার অসুখের চিকিৎসার অজুহাতে রাঞ্ঝার সঙ্গে দেখা করতে আসে। রাঞ্ঝা সারা দেহে ভস্ম মেখে বসেছিল। সে হীরকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় আর হীর তখন ঃ

অব্বল পৈর পকড়ে এতকাদ করকে,
ফের নাল কলেজে দে লগ্‌্গ গঈ।
নবাঁ তৌর অজুবে দা নজর আয়া,
দেখো জল পাতঙ্গ তে অগ্‌্গ গঈ।
কহী লগ গঈ চিণগ বগ্‌্গ গঈ,
খবর জগ্‌্গ গঈ, বজ ধ্রগ গঈ।
য়ারো ঠগগাঁ দী রেওড়ী হীর জট্টী,
মুহঁ লগ দেয়েঁা জোগী নুঁ ঠগ্‌্গ গঈ।
অগ্‌্গে ধুয়াঁ, ধুখায়া জোগিয়াঁ দা,
হুন ফ্‌ক কে ঝুগড়ে অগ্‌্গ গঈ।[1]

[1] প্রথমে পরম শ্রদ্ধায় তাকে প্রণাম করে, কিন্তু পরক্ষণেই তার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়। এ যেন এক নতুন বিচিত্র ঘটনা—আগুন পতঙ্গের মধ্যে এসে জ্বলে শেষ হল। একটি স্ফুলিঙ্গ এমন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠলো যে সারা পৃথিবী সেই আলোর ছটা দেখতে পেল। নাকাড়া ধ্বনিতে মুখরিত হল যে হীর এক জটাজুটধারী যোগীর কাছে আসতে না আসতেই তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। একে যোগীর ধুনী আগে থেকেই জ্বলছিল, এখন সে আগুনে ঘর-বাড়ী পুড়ে ছাই হল।

হীর শ্মশান থেকে ফেরার পথে সৈতীকে বলে—'এবার এমন একটা উপায় খুঁজে বার কর যাতে তুই মুরাদকে ফিরে পাস আর আমি আমার প্রিয়তমকে পাই। আমাদের দুজনের যৌবন তো প্রতীক্ষার দিন গুনে গুনে বিদায় নিতে চলেছে। আমার রোজ রোজ শ্মশানে আসা ভাল দেখাবে না। এমন একটা উপায় বার কর যাতে বাড়ীতে বসেই প্রিয়তমকে দেখতে পাই।...'

যা হোক হীর আর সৈতীর পরামর্শ পাকা হয়ে গেল। সৈতী তার মাকে বলে রাজী করায় যে হীরের অসুখ ভাল করার জন্যে তার একটু আধটু বাইরে বেড়াতে যাওয়া দরকার। পরের দিন সকালে সৈতী, হীর আর তাদের বান্ধবীরা কুয়ায় জল আনতে গেল। হীর বাবলার একটা বড় কাঁটা ইচ্ছে করে পায়ে ফোটায় এবং সৈতী ও অন্য সকলে চেঁচামেচি করতে থাকে, হীরকে সাপে কামড়েছে বলে। হীর দাঁত কামড়ে দম বন্ধ করে মাটিতে শুয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে তার সারা শরীর ফ্যাকাসে-নীল হয়ে যায়। হীরকে খাটিয়ায় শুইয়ে সকলে বাড়ীতে আনে। গাঁয়ের বিজ্ঞ এবং সাপুড়েদের ডেকে আনা হল কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হল না। তখন সৈতী জানাল, শ্মশানে এক যোগী পুরুষ এসেছে—তাকে সিদ্ধ এবং সর্বজ্ঞ বলে মনে হয়। মেয়েরা সৈদাকে যোগীর কাছে পাঠায় কিন্তু যোগী তাকে লাঠি দিয়ে এমন তাড়া করে আসে যে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে আসে। শেষে সৈদার বাবা অজ্জু নিজে যোগীর কাছে গেল। যোগী মনে মনে তাই চাইছিল—সে রাজী হয়ে যায়। তারপর কি হল:

মন্তর ইক তে পুতলিয়াঁ দো উড্ডন,
অল্লা বালেয়াঁ খেল রচায়া ঈ।
খিসকু শাহ হোরী অজ আণ লথে,
তম্বূঁ আণ উধালুয়াঁ লায়া ঈ।[1]

সৈতী সমস্ত কিছু বন্দোবস্ত নিজের হাতে তুলে নেয়। গ্রামের বাইরে ডোমেদের ঘরে সে যোগীর থাকার ব্যবস্থা করে। যোগী মহারাজ জানালেন, 'ঘরে কেবল কনে নিজে থাকবে কিংবা তার সঙ্গে একজন কোন কুমারী মেয়ে থাকতে পারে। অন্য সকলে যেন চলে যায়।' কনেকে কোন ভয়ঙ্কর বিষধর সাপে কামড়েছে বলে মনে হচ্ছে:

না এ ফনীঅর না এ তিলিয়র
না বৈনাক কৌড়ো হোঈ।
না এহ কক্কড় না সঙ্গচূড়ন,

1. সুর একই কিন্তু দুটি পুতুল ভিন্ন ভিন্ন তালে নাচছে। ভগবানের এ কি বিচিত্র লীলা। বাটপাড়ের সম্রাট আজ যেচে এসেছে—মেয়ে লুণ্ঠনকারীরা শিবির পেতে বসে আছে। এটি বারিস শাহ্-র রচনা।

এনা বিচ্চোঁ না কোঈ !
এঁ তাঁ খাধী চোটিয়াঁলে বিসীয়র
বৈয়থোঁ ছুট্টন মুশ্‌কল হোঈ ।[1]

এ কথা শুনে সকলেই বেশ ভয় পেয়ে সেখান থেকে চলে যায়। যোগী, সৈতী আর হীর কেবল সেখানে থাকে। মাঝরাত্রে রাঞ্ঝা পীরদের স্মরণ করে। পীর বহাউদ্দীন জাকারিয়া ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে রাস্তা তৈরী করে দেন। হীর আর রাঞ্ঝা কুঁড়ে থেকে বেরোবার উদ্যোগ করতে সৈতী বলে, 'আমারও প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা করে দাও।' রাঞ্ঝা আবার পঞ্চপীরদের স্মরণ করে। দেখতে দেখতে মুরাদ বলোচ উটের পিঠে চেপে সেখানে হাজির হয়।

3

সকাল হতেই খেড়ে দুটো দলে ভাগ হয়ে হীর আর সৈতীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। প্রথম দল বলোচের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে আসে কিন্তু দ্বিতীয় দল রাঞ্ঝাকে ধরে ফেলে। তারা রাঞ্ঝাকে পিটিয়ে আধমরা করে হীরকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। রাঞ্ঝা রাজা অদলীর কাছে নালিশ জানায়। রাজা অদলী তাঁর নিজের লোক পাঠালেন হীর আর খেড়েকে বন্দী করে আনতে। খেড়ে জানাল, 'মহারাজ, লোকটা একনম্বর জোচ্চর, আমরা একে বাজিকর মনে করে আমার স্ত্রীর চিকিৎসা করতে ডেকেছিলাম কিন্তু এ আমার বউকেই নিয়ে পালিয়ে যায়।' রাজা হীরকে খেড়ের হাতে সমর্পন করলেন। এই অন্যায় বিচার দেখে রাঞ্ঝা দুঃখে আর্তনাদ করে উঠতে শহরের চারদিকে আগুন জ্বলে ওঠে। রাঞ্ঝার সেই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে রাজার বিশ্বাস জন্মায় যে রাঞ্ঝার দাবীই খাঁটি। তিনি হীরকে রাঞ্ঝার হাতে তুলে দিলেন। খেড়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে রংপুরে ফিরে এল।

হীর আর রাঞ্ঝা কিছুদিন পাহাড়ী অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর পর ঝংগে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ঝংগের কাছাকাছি পৌঁছতেই গ্রামের রাখালরা কূচককে তাদের কথা গিয়ে জানায়। তারা এসে হীর-রাঞ্ঝাকে সমাদর করে বাড়ী নিয়ে যায়। তারা রাঞ্ঝার কানের দুল খোলে, মাথার জটা কেটে পরিষ্কার করে, যত্ন করে খাওয়ায় এবং বিশ্রামের জন্য নক্সাকাটা পালঙ্কের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এইসব আদর যত্ন কেবল লোক দেখানোর জন্যই। ভেতরে তারা বদনামের ভয়ে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল।

1. এ কোন ফণাওলা সাপ নয়, ঢোঁড়াও নয়, আবার সাধারণ বিষধরও নয়। এ কেউটে কিংবা শঙ্খচূড়েরও কাজ নয়। একে ঝুঁটিওলা বিষধর কোন কিছুতে কামড়েছে। এর বিষ বার করা আমার পক্ষে খুবই মুস্কিল ব্যাপার। এটি দামোদরের রচনা।

শেষে তারা শঠতার আশ্রয় নিল এবং রাঞ্ঝাকে বলল, দেখো, 'এটা ঠিক ভাল দেখাচ্ছে না। তুমি তখ্‌ত হাজারা ফিরে গিয়ে বরযাত্রীর দল নিয়ে এসে হীরকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করে নিয়ে যাও।' রাঞ্ঝা তৎক্ষণাৎ তখ্‌ত হাজার ফিরে যায়। ফেরার সময় সে ভাবতে থাকে এবার বৌদিদের ঠাট্টার উপযুক্ত জবাব দিতে পারবে। কিন্তু ভবিতব্য যে তার কপালে অন্য কথা লিখেছে।

রাঞ্ঝার বিদায়ের পর হীরের বাবা হীরকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে এবং রাঞ্ঝাকে খবর পাঠায় যে তাঁরা ভেবেছিল এক কিন্তু বিধির বিধান ছিল অন্য। রাঞ্ঝার হাতে চিঠি তুলে দেবার সময় কাঁদতে কাঁদতে পত্রবাহক জানাল হীর পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছে।

সে কথা শোনা মাত্র দুঃখে প্রাণত্যাগ করে রাঞ্ঝা।

4

হীরের কাহিনী সর্বপ্রথম লিখে ছিলেন কবি দামোদর। তিনি ঝংগের সরকারী খাজাঞ্চি ছিলেন। কাহিনীর মধ্যে অনেক জায়গাতেই তিনি লিখেছেন—'হীরের এই ঘটনা কবি দামোদর সচক্ষে দেখেছে।' দামোদর হিন্দু কাহিনীকারদের রীতি অনুযায়ী গল্পের বিয়োগান্ত পরিণতি টানেন নি, তাঁর কাহিনীর শেষে দেখা যায় হীর আর রাঞ্ঝা হজতীর্থ দর্শনের জন্যে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। এমনিতেও কবি দামোদরের কাহিনীর রাঞ্ঝাকে বারিস শাহের বর্ণনার রাঞ্ঝার মত সুদেহী, স্বাস্থ্যবান পাঞ্জাবী বলে মনে হয় না ; বরং মুরলী-মনোহর শ্রীকৃষ্ণের মতই বসনে ভূষণে সজ্জিত বাল-গোপাল বলে মনে হয়। কবি ধীম্বরী মসজিদে গিয়ে রাঞ্ঝার নির্লোভ সরলরূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন :

দেখ বিকাণী ঝীবরআনী,
কদম উঠীবস নাহীঁ।
হে! জে চুখ বড়েরা হোবে,
তাঁ আপ নিয়াহ করাঈঁ।[1]

কিন্তু দামোদরের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে বারিস শাহ কাহিনীটি বিয়োগান্তক করে রচনা করেছেন। সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান বলেই হয়ত বারিসশাহের দুঃখজনক পরিণতির অভিজ্ঞতা কিছুটা ব্যাপক। তাই তিনি কাহিনীটিকে বিয়োগান্তক করে আরো মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন।

অনেকেই হীরের এই গল্পটিকে কাল্পনিক বলে মনে করেন। কিন্তু ঝংগে হীরের

1. একে দেখে ধীম্বরী কানাকড়িতে বিকিয়ে যেতে প্রস্তুত। দেখার পর ফিরে আসতে আর পা সরে না। যদি সম্ভব হত তো আমি নিজে এর সঙ্গে বিয়ে দেওয়াতাম।

সমাধি মন্দির আজও বর্তমান রয়েছে, এবং লোকে এখনো তাকে "হীর মাতা" বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। এই সমাধি মন্দিরটি বর্তমান থাকাতে একটা কথা প্রমাণিত হয় যে লোকমুখে অল্প বিস্তর পরিবর্তন ঘটলেও মূল কাহিনীটি বাস্তবিক ঘটনা। তাছাড়া পাঞ্জাবী জনমানসে এই গল্পটির এমন গভীর প্রভাব যে আজ হীর-রাঞ্ঝা কেবলমাত্র সাংসারিক প্রেমের প্রতিভূই নয় বরং তাদেরকে আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ বলেও গণ্য করা হয়।

গুরুবক্স সিং

মিরজা সাহিবান

খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটি মেয়েকে এক বাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক পাড়তে দেখা গেল। বাড়ীটি থেকে তারই সমবয়সী একটি ছেলে বেরিয়ে এসে মেয়েটির আপত্তি সত্ত্বেও তার বইয়ের ব্যাগটা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করে।

'আচ্ছা মিরজা, তুই আমাকে কেন আমার নিজের ব্যাগ নিয়ে যেতে দিস না?'

'তোর ব্যাগটা বয়ে নিয়ে যাই বলে তবু মসজিদের পাঠশালায় যেতে ইচ্ছে করে, নইলে আমার তো পড়াশোনা করতে ভাল লাগে না,'—ছেলেটি ভালো মানুষের মত জবাব দেয়।

'কিন্তু তোকে আমি কত করে পড়তে বলি। আমার তো লেখাপড়া করতে খুব ভাললাগে। আমি এখন একটা খুব ভাল বই পড়ছি'—এই বলে মেয়েটি তার সঙ্গীর কোমর জড়িয়ে ধরে ঘনিষ্ট হয়ে হাঁটতে থাকে।

'ঠিক আছে সাহিবান, তুই যেমন ভাবে পড়তে বলবি আমি চেষ্টা করবো। কিন্তু মৌলবী কি যে পড়ায় তার কিছুই আমার মাথায় ঢোকে না।' তাঁর পাঁজরে মেয়েটির হাতের কটা আঙুলের স্পর্শ লাগছে, মনে মনে সে তাই গুণতে চেষ্টা করে।

মৌলবী এসে চাতালে বসেন। ছেলেদের ভীড়ের মধ্যে মিরজার দিকে লক্ষ্য পড়ে তাঁর। সে সাহিবানের ডান দিকে অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল।

'সাহিবান তোমার এই বন্ধুটিরও পড়াশোনার দিকে একটু মন লাগাতে চেষ্টা কোরো—দেখো দেখি, কেমন গোঁজ হয়ে পাথরের মত নিশ্চল বসে রয়েছে। মসজিদের বাইরে তো খুব চটপটে থাকতে দেখি।'

'আজ্ঞে, আমি আজকেই ওকে বুঝিয়েছি, ও বলেছে এবার থেকে পড়াশোনা করবে।'

'দেখো বাপু মিরজা, ফের যদি কাল তোমাকে এমন পাথরের মূর্তির মত বসে থাকতে দেখি, তো আমি তোমার বাবাকে খবর পাঠাবো যে তোমাকে যেন দানাবাদেতেই নিয়ে যায়। এখানে তুমি মিছিমিছি আমার আর তোমার দুজনেরই সময় নষ্ট করছো।'

মৌলবীজী! আপনি আর কয়েকদিন একটু দেখুন,'—সাহিবান তাড়াতাড়ি

বলে ওঠে,—'আমি বীবো পিসীর বাড়ীতে গিয়ে ওকে পড়িয়ে আসবো। ওর এখনো পড়ার দিকে মন জাগেনি তাই, নইলে ও খুব বুদ্ধিমান ছেলে!'

মসজিদের ছুটি হতেই সাহিবান মিরজার সঙ্গে বীবো পিসীর বাড়ীতে গিয়ে মৌলবীর কথা সব শোনায়। বীবো নিজেও মিরজাকে অনেকবার পড়াশোনা করার কথা বলেছে কিন্তু তাঁর আজকের কথা মিরজার মনে দাগ কেটে বসে।

'খোকা, মৌলবী যদি চৌধুরী ভাইকে লিখে জানায় এসব কথা, তাহলে সে ঠিক ভাববে যে আমি তোর দিকে কোন নজর দিই না। চিঠি পেলেই সে দুদিনের মধ্যে এসে তোকে নিয়ে চলে যাবে, আর আমাকে সারাজীবন বোন আর ভাইসাবের কাছে লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকতে হবে।'

বীবোর নিজের কোন ছেলেপুলে ছিল না বলে সে তার বোনের কাছ থেকে মিরজাকে মানুষ করবে বলে চেয়ে নিয়ে আসে। সিয়ালের মৌলবীদের পড়ানোর ব্যাপারে বেশ নামডাক ছিল। সাহিবান মিরজার মামার মেয়ে।

'আর পিসী, তাহলে আমার পড়াও বন্ধ হয়ে যাবে।'—সাহিবান বলে—'মাতো আগেই বলেছিল, আমি এখন বড় হয়ে গেছি, আমার আর মসজিদে পড়তে যাওয়া ঠিক নয়—আমার সঙ্গে মিরজা যায় বলাতে তবে মা রাজী হয়েছে। এর পরে আর মা রাজী হবে না।'

মিরজা যেন গভীর চিন্তায় ডুবে যায়।

'দেখ দেখি খোকা,'—মাসী আন্তরিক স্বরে বলে—'তুই আছিস বলে তবু আমার শূন্য ঘরবাড়ী ভরে আছে—আমার মুখ চেয়ে তুই একটু মন দিয়ে পড়াশোনা কর, নইলে বোনের কাছে আমার বদনাম হয়ে যাবে।'

স্নেহের এই দাবী মিরজার মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। সে এক বছরের ফাঁকি একমাসে পূরণ করে ফেলে। মৌলবীও ক্লাসে মিরজাকে বেশ কয়েকবার পিঠ চাপড়ান।

এর আগে মিরজার কেবল একটা কাজই ভাল লাগত, সেটা হল সাহিবানের সঙ্গে এক সাথে মসজিদে যাওয়া আর ফিরে আসা। এখন তার সারাদিনই আনন্দে কাটে—মাসীও খুশি, মৌলবীও খুশি আর সাহিবান...সে এখন রোজ তার বাড়ীতে আসে। এখন সারাদিনই সে স্কুলের পড়া মনে মনে আওড়ায় আর সে সময় তার মনে হয় সাহিবান তার পাশেই বসে রয়েছে।

আগে সে কেবল স্বপ্ন দেখতো যে সে সাহিবানের বইয়ের ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে আর তার কোমরে জড়িয়ে ধরা সাহিবানের হাতের আঙুল গুণতে গুণতে সে চলেছে। মসজিদ যেন অনেক দূরে, সে কেবলই হাঁটছে, তার মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠতো। সে আনন্দকে এখন সে আর মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না, তার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

এখন সে অন্য আর এক স্বপ্ন দেখতে থাকে...সাহিবান তাকে পড়াচ্ছে, একসময় বই শেষ হয়ে যায়...শেষ বইটা রেখে সাহিবান দীপ্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে

থেকে একসময় তার হাত ধরে বলে—'আর তোকে আমি কি পড়াবো? আমার যাকিছু ছিল সব তুই পড়ে শেষ করে ফেলেছিস।' সাহিবানের আঙুলের স্পর্শে তার মনে যেন নতুন পাঠ জন্ম নিতে থাকে—তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু জাগরণের অবস্থাটা স্বপ্নের মত মধুর নয় দেখে সে আবার চোখ বন্ধ করে। 'কি হল মিরজা! এত পড়েও তোমার মন ভরল না, আবার ফিরে এসেছো?' সে সাহিবানের মুখে হাসির ঝলক দেখে বলে, 'আমি পড়তে আসিনি, তোর কাছে এসে বসলে দূর আকাশে ভেসে যেতে ইচ্ছে করে. ঘোড়া নিয়ে এসেছি। সাহিবান, তুই আমার পেছনে উঠে বোস।' তারপর আর তারা মাটিতে থাকে না, স্বপ্নের আকাশে উড়ে বেড়াত।

সে বছরটা মিরজা আর সাহিবানের জীবনে এক অন্তরঙ্গ মধুময় স্মৃতি হয়ে রইল। সারাদিনের আনন্দময় মুহূর্তগুলি রাতের তারা হয়ে তাদের স্বপ্নের আকাশে ঝিকমিক করতে থাকে আর এই ধূসর পৃথিবী ও আকাশ রামধনুর বর্ণালী রঙে রঙীন হয়ে যায়। দুটি কিশোর প্রাণ একে অন্যের কাঁধ ও কোমর জড়াজড়ি করে ধীরে ধীরে যৌবনের উন্মাদনাময় উদ্যানে প্রবেশ করে যেন।

মিরজার বাবার কাছে খবর গেল যে ছেলে লেখাপড়া ভালই করছে। তিনি একদিন ছেলেকে দেখতে এলেন। ছেলের বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে তার মনে অন্য এক বাসনা জাগে। এই যৌবন তারুণ্যকে কর্মকুশল চৌখস করে তুলতে হবে। তিনি ঠিক করলেন, 'তীর চালানো আর ঘোড়ায় চড়াতে একে অদ্বিতীয় হতে হবে—যাতে শত্রু কখনো এর চুলের ডগা পর্যন্ত না স্পর্শ করতে পারে।' তিনি তার শালী বীবোর সঙ্গে আলোচনা করেন। বীবো জানান, মিরজাকে আরো এক-বছর লেখাপড়া করানো দরকার। 'না বীবো'—বিজ্জল খরল মাথা নেড়ে বলেন, 'লেখাপড়া অনেক করেছে। জমিদারদের শত্রু অনেক, ওর এখন উঠতি যৌবন—ওকে আমি এবার ভাল করে তলোয়ার চালাতে, তীর ছুঁড়তে আর ঘোড়ায় চড়তে শেখাবো।' ঠিক হল, মিরজা বাবার সঙ্গে দানাবাদ ফিরে যাবে, কিন্তু সাহিবান বিজ্জল পিসেকে ধরে মিরজাকে দু'দিন তাদের বাড়ীতে রাখার কথা রাজী করিয়ে নেয়। সে দুটো দিন মিরজা আর সাহিবান এক মুহূর্তের জন্যেও পরস্পরকে ছেড়ে থাকে না। তারা দুজনে এক সাথে বসে খাওয়া দাওয়া করে।

'সাহিবান, তোর বইয়ের যে গল্পটা সব থেকে তোর ভাল লাগে সেটা আমাকে পড়ে শোনা।'—মিরজা অনুরোধ করে। সাহিবান বই নিয়ে আসে। বইয়ের এ পাতা সে পাতা উল্টে-পাল্টে খুঁজে সে শেষে একটা গল্প শোনায়। এক রাজকুমারীর প্রেমের গল্প।

'এ গল্পটা তুই এমন সুন্দরভাবে বললি, যেন মনে হচ্ছে তোর নিজের জীবনের ঘটনা,'—গল্প শেষ হতে মির্জা উচ্ছসিত কণ্ঠে জানায়।

'মিরজা তুই ভীষণ ইয়ে হয়েছিস'—সাহিবান মিরজার চিবুকে হাত রেখে এমনভাবে বলে, যেন কৈশোরের চৌকাঠ পেরিয়ে হঠাৎ যুবতী হয়ে ওঠা কোন প্রেমিকার আচরণ বলে মনে হয়।

'সাহিবান! আর একটা গল্প শোনা।'—সাহিবানের গল্প বলার ক্ষমতাকে তারিফ করে মিরজা মিনতি জানায়। এক এক করে সাহিবান আরো চারটে গল্প শোনায়। গল্প বলতে বলতে হঠাৎ তার কি যে খেয়াল হয় কে জানে, সে মিরজার কাঁধে হাত রেখে বলে, 'আচ্ছা মিরজা, তোর সাহিবানের কথা কখনো মনে পড়বে?'

অন্ধকার ঘরের দরজা জানালা সব একসঙ্গে খুলে দিলে হঠাৎ আলোর বন্যায় যেমন প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তেমনিই তার সমস্ত অন্তর উত্তর দেবার জন্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেও সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

সাহিবান মিরজার মনের অবস্থা অনুমান করতে পারলেও না জানার ভাণ করে বলে, 'তাহলে মিরজা, তুই আমাকে একদম ভুলে যাবি?'

'সাহিবান, তোর কথা কি কখনো আমি ভুলতে পারি।'—শেষ পর্যন্ত মিরজা অস্ফুট স্বরে জবাব দেয়।

সাহিবান সেই অস্ফুট ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে থাকে—তখনো তা স্পন্দনমুখর। মুখ তুলে সে চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে সেখানে অবরুদ্ধ অশ্রু কানায় কানায় ভরে উঠেছে। পাছে তা কান্না হয়ে ঝরে পড়ে তাই সাহিবান তাকে ভোলানোর জন্যে বলে, 'ঠিক আছে বল তুই, আমার কোন কথাটা তোর বেশি মনে পড়বে।' নিজের দুহাতের মধ্যে মিরজার হাত দুটো তুলে নিয়ে সে আদর করতে থাকে।

'আমার কোমরে জড়ানো তোর হাত...না, না আমাকে তোর পড়াতে আসা—না, তাও নয়—সব থেকে বেশি মনে থাকবে, তুই যখন জানতে চাইতিস আমি রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছি, আর স্বপ্নের কথা শুনে তোর মুখের সেই বিস্মিত চেহারাটা সব সময় আমার চোখের সামনে ফুটে উঠবে... না সাহিবান, এটাও ঠিক হল না—সত্যি করে বলবো? আমি এখন ঠিকমত বলতে পারবো না, আমি তোর কোন কোন কথাগুলো মনে করবো। তবে একটা কথা আমি জানি, আমি তোকে কোনদিন ভুলতে পারবো না।'

পরের দিন সকালে জল খাবারের পর বিজ্জল খরল রওনা হবার জন্যে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসেন। মিরজা মাসীর কাছে বিদায় নিয়ে তার পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে নিজের স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে সাহিবানকে দেয়। তার বাবা তাগাদা দিতে থাকায় সে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। সাহিবানের দিকে বার বার ফিরে তাকাতে তাকাতে শেষ পর্যন্ত সে বাবার পেছনে ঘোড়ায় চেপে বসে।



দানাবাদে পৌঁছেই বিজ্জল খরল মিরজাকে তলোয়ার চালানো, তীর ছোঁড়া এবং ঘোড়ায় চড়াতে এক ওস্তাদ সর্দারের কাছে শেখানোর ভার দেয়।

মিরজার চড়বার জন্যে তার বাবার আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া বাছা হল।

দুরন্ত বেগে উড়ে চলা ঘোড়াটার স্বভাব ; যে-সে কেউ সেই ঘোড়ার পিঠে চাপতে পারতো না, কিন্তু ঘোড়াটা প্রথম থেকেই মিরজার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।

বছর কেটে যায়। তার স্বপ্নের পক্ষীরাজ ঘোড়া মিরজা পেয়ে গেছে। সে ভাবে, কবে তার স্বপ্নের রাণীকে এই ঘোড়ার পিঠে তুলে নিতে পারবে। তার সেই স্বপ্নের রাণী তাকে স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে "অলফলৈলা" বইটি দিয়েছিল। সাহিবানের কাছে শোনা গল্পগুলো সেই বই থেকে যেদিন পড়ে, সে রাতে সে যেন নিজেই গল্পের বাদশা হয়ে যায়। তার পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে সে সাহিবানের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে থাকে... অনেকবারই তার সিয়ালের দিকে যাবার বাসনা হয়েছে। সাহিবানের অসামান্য রূপের খ্যাতির খবর তার কাছে মাঝে মধ্যে এসে পৌঁছায়।

সাহিবান এখন যুবতী—তার দেহতটে এখন যৌবনের তরঙ্গ কানায় কানায় ভরে উঠেছে। সে বীবো পিসীর বাড়ীতে প্রায় রোজই যায়। পিসী বার কয়েক দানাবাদে এসে মিরজার সঙ্গে দেখা করে গেছে।... 'এখন তাকে কি সুন্দর যে দেখতে হয়েছে।'—পিসীর মুখে একথা শুনে সাহিবানের ভীষণ ভাল লাগে। সে বলে, 'পিসী, তুমি তাকে একবার কিছুক্ষণের জন্যে সিয়াল থেকে ঘুরে যেতে বলো না কেন?'

'সে তো এখানে আসবার জন্যে ছটফট করছে—কিন্তু ভাইসায়েবের মাথায় ভূত চেপেছে যে, মিরজার মত ঘোড়সওয়ার, তীরন্দাজ আর তলোয়ার চালানোতে দ্বিতীয় আর যেন না কেউ হতে পারে—তার ওস্তাদ সবসময় তার পেছনে পড়ে রয়েছে।'

'পিসী, ওর কি কখনো মনে পড়ে যে আমিও একদিন ওর ওস্তাদ ছিলাম?' সাহিবান জিজ্ঞেস করে।

'মনে থাকার কথা জানতে চাইছিস? ও তোর সেই বইটা আমার কাছে নিয়ে এসেছিল—যেটা তুই তাকে দিয়েছিলিস। সে বল্লে—'যখনই আমি সময় পাই না কেন এই বইয়ের থেকে রোজ একটা না একটা গল্প পড়ে নিই। মাসী, তুমি সাহিবানকে এ কথাটা বোলো।'

অনেক রাত পর্যন্ত সাহিবান ঘুমোতে পারে না। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে থাকে, মিরজাকে এখন কেমন দেখতে হয়েছে, এখন যদি সে এখানে আসে তাহলে আগের মত সে কি তার কোমর জড়িয়ে ধরতে পারবে? আর যদি মির্জা তার কাঁধে হাত রাখে, তাহলে তার নিজের কেমন লাগবে? তার সারা শরীরে বিদ্যুত শিহরণ খেলে যায়। একসময় তার দুচোখে ঘুম নেমে আসে, মিরজা এসে স্বপ্নে দেখা দেয়, তাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে মেঘের দেশে উড়ে যায়।



সাহিবানের বিয়ের কথাবার্তা চলতে থাকে। অনেকেরই মিরজার কথা মাথায় আসে, বীবো তো সাহিবানের মাকে বলেই ফেলে যে, মিরজার মত ছেলে পাওয়া

যাবে না। কথাটা সাহিবানের মার মনে ধরে, সে সাহিবানের দাদু খীবা খাঁর মতামত জানতে চায়। কিন্তু খীবা খাঁ খুবই হিসেবী মানুষ। তিনি বল্লেন, 'কিন্তু মা, আমাদের এই একটি মেয়ে, তার বিয়েতে আরো একটা বড় ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক করার সুযোগ ছেড়ে দিলে কি চলে? বিজ্জল খাঁ তো আমাদের নিজেদেরই লোক। চন্ধররা আমাদের পালটি ঘর, একটু বদমেজাজী আর জেদী হলেও তার ছেলে তাহির চমৎকার পাত্র। এদের সঙ্গে সম্পর্ক হলে এই সমস্ত এলাকাটাই আমাদের হাতে আসবে।'

দাদুর মতলব শুনে সাহিবান খুব কান্নাকাটি করে। বীবো পিসীর বাড়ী গিয়ে কেঁদে বলে, 'পিসী, তুমি গিয়ে মিরজাকে বলো, তার বাবা-মাকে দিয়ে চাপ দিতে। এখানে তুমি আর পিসেও গিয়ে বলো। তবুও কি দাদু রাজী হবে না?'

বীবো দানাবাদে যায়। বোন আর ভগ্নিপতীর সঙ্গে পরামর্শ করে। বোন তার বাবাকে ভাল করেই জানে, বিজ্জলের নিজের আত্মসম্মান জ্ঞানও খুবই প্রবল। সে বলে—'খীবা খাঁ চন্ধারের পরিচয়টা জানুক ভাল করে; আমি তার কাছে কিছু বলতে যাবো না।' বিজ্জল পরিষ্কার ভাবে, না বলে দেয়। বীবো শেষে মিরজাকে বোঝায়, সে নিজে গিয়ে যেন খীবা খাঁকে জানায় সাহিবানের ওপরে তার দাবী সকলের আগে। সে বলে, 'মাণিক আমার, আর দেরী করিসনি যেন। নাপিত চন্ধরের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা পাড়তে গেল বলে, আর ওধারে সাহিবান খাওয়া দাওয়া সব ত্যাগ করেছে।'

মিরজার তীর চালানো আর ঘোড়ায় চড়া সব মাথায় উঠল। মাসীর পেছনে পেছনে সেও সিয়ালে এসে উপস্থিত হল। সাহিবানের তখন সে এক অকল্পনীয় অবস্থা। এই দেখা হওয়ার ব্যাপারে সে মনে মনে অনেক কল্পনা করে রেখেছিল। কিন্তু মিরজাকে দেখে তার হাত সরে না, মুখে কথা ফোটে না। তার এতদিনের স্বপ্ন অবিশ্বাস্য ভাবে হঠাৎ যেন আজ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। মিরজা তার দিকে তাকায়। একবার মনে হয়েছিল, তার কাঁধে হাত রাখে কিন্তু এ কাঁধ সেই আগের কাঁধ আর নেই। আর সাহিবানের হাতও আর সেই আগের হাত নয় যে, হাত দিয়ে সে একদিন বিনা দ্বিধায় মিরজার কোমর জড়িয়ে ধরতে পারতো...

'সাহিবান!' মিরজা মুখ ফুটে কেবল এটুকুই বলতে পারে।

'মিরজা!' জবাবে সে এছাড়া আর কিছুই বলতে পারে না।

মিরজা একসময় সাহসে বুক বেঁধে তার দাদা মশাইকে গিয়ে বলে, "দাদু, আমি আপনার নাতি ছিলাম এতদিন। এবার আমাকে আপনাদের নাতজামাই করে নিন। সাহিবানের সঙ্গে আমি একসাথে খেলেছি—একসাথে পড়েছিও। ওকে অন্য কারুর হাতে তুলে দিলে আমার ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হবে।'

'বাবা, মিরজা, তোকে তো আমার খুবই ভাললাগে। সাহিবানের যদি আর একটা বোন থাকতো তো তোর কথা আমি ফেলতাম না কখনো। আমার ইচ্ছে চন্ধরদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে নিশ্চিন্ত হই। আমাদের সঙ্গে কেউ তাহলে কখনো

চোখ রাঙিয়ে কথা বলতে সাহস করবে না—তোরা তো আমাদের আপনার লোক রয়েছিসই।'

মিরজা বেশ জোরের সঙ্গে বলে—'এখনো কারোর আপনার ওপর চোখ তুলে কথা বলার সাহস নেই। আমি বাপের এক ছেলে হলেও একাই এগারো জনের সমান।'

'তোর মনে আঘাত দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে খুবই। কিন্তু আমি ঘটকালি করতে ওদের কাছে নাপিত পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন আর আমার কথা মিথ্যে হতে দিতে পারি না।'—জেদী দাদামশাই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করে দেন। মিরজা দাদামশায়ের কাছ থেকে ফিরে এসে মাসীকে বলে তার বাড়ীতে সাহিবানের সঙ্গে তার একবার দেখা করানোর ব্যবস্থা করতে।

□

অনেক বছর বাদে এই বাড়ীতে সে আবার সাহিবানের প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে। একদিন তার দুচোখ কেবল সাহিবানের পথ চেয়ে থাকতো, আর আজ তার সমস্ত দেহমন সাহিবানের জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

'সাহিবান এইবার আসবে...তখন ও আমার থেকে লম্বা ছিল, এখন ও কেবল আমার কাঁধের সমান। আমি ওকে আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবো।' সাহিবান এসে পৌঁছয়। আজ তার পায়ে ঝুমুর ছিল না, তবু মিরজার মনে হল তার পায়ে নূপুরের ঝঙ্কার যেন আগের থেকে অনেক বেশি মুখর। তাকে দেখে তার অল্পক্ষণ আগের বাসনাটা বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে।

সে কাছে আসতে মিরজা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। সাহিবান কম্পিত হাতে মির্জার কোমর জড়িয়ে ধরে আর মিরজা তার সলজ্জ হাত দুটি সাহিবানের কাঁধে রাখে। কিন্তু অন্যকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধার ইচ্ছাটা দুটি হাতেই লজ্জায় সঙ্কুচিত হতে থাকে।

সাহিবানের দুচোখে এক আশ্চর্য দীপ্তি। সে চোখের দৃষ্টিতে একটা পাখী যেন ডানা ঝাপটাতে থাকে। তার অন্তরাত্মা-পাখীটি আজ চোখের পলকে এসে বসেছে, ডানা মেলে সচ্ছন্দে ওড়ার বাসনায় একটি হৃদয়ের অলিন্দ খুঁজে ফিরছে। সেই আকাঙ্ক্ষিত অলিন্দ সে যেন মিরজার দুচোখে প্রতিবিম্বিত দেখতে পায়। ডানা ঝাপটানোর একটা অস্পষ্ট শব্দ। তারপরেই ডানা মেলে পাখীটি ঝাঁপিয়ে পড়ে মিরজার দু'বাহুর নিবিড় বন্ধনে। বাহুবন্ধন যখন শিথিল হয়, তখন তাদের দুচোখে অপরিচয়ের আর কোন শঙ্কা থাকে না। একের চোখের তারায় কেবল অন্যের, প্রতিবিম্বই ধরা পড়ে না, হৃদয়ের স্পন্দনও যেন শোনা যায়। মনের আগল খুলে দিতে আর কোন বাধা নেই—কোন কথা বলার আর অসুবিধা থাকে না।

'মিরজা, এখন তাহলে তুমি কি করবে?'—সাহিবান জানতে চায়।

'তুমি যে কেবল শুধু আমারই রয়েছ এটুকু জানবার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম। এখন দুনিয়ার আর কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'কিন্তু চন্ধরের শুনেছি ছেলের পাল রয়েছে?'

'এই দু:টো হাত একটা সৈন্যদলের সমান। মিরজা সাহিবানের কাঁধে দু হাত রাখে।

'কিন্তু মিরজা, তোমাকে হয়তো আমার ভাইয়েদের সঙ্গেও লড়তে হতে পারে'—সাহিবানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

'না সাহিবান তা হবে না। ওরা আমারও ভাই। আমার তীর আর এই ঘোড়া থাকতে আমাকে কারোর সঙ্গেই লড়াই করতে হবে না। কারুর সাহসই হবে না। কিন্তু তুমি যদি তোমার বাবা-মায়ের বদনাম হতে পারে ভেবে ভয় পেয়ে থাকো তো বলে দাও সে কথা!'—মিরজা তার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নেয়।

'বদনাম তো তারা নিজেরাই ডেকে আনছে। আমি শুধু চাইছিলাম আমার জন্য যেন ওদের কারুর কোন আঘাত না লাগে। যে গাছে আমি জন্ম নিয়েছি, প্রস্ফুটিত হয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত তোমার মত রাজপুত্রের নজরে এসেছি, সে গাছের যেন কোন ক্ষতি না হয়।'

'তবে তুমি আর কোন ভাবনা চিন্তা কোরো না। সময়মত কেবল আমার কাছে খবরটা পাঠাতে হবে—জানবে, আমি আর আমার ঘোড়া ঠিক এসে হাজির হয়েছি।'

পরের দিন সাহিবান যখন শুনতে পেল নাপিত চন্ধরদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা করে এসেছে তার মনে হল, কেউ যেন তার স্বপ্নের ডানা দুটো কেটে দিয়েছে। তার নিজের গ্রামেও বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়—যতই দিন এগিয়ে আসতে থাকে সাহিবানের মন ভেঙ্গে পড়তে থাকে আর পনেরো দিন বাকী, চোদ্দ দিন...এক হপ্তা, তিন দিন—শেষে আসন্ন মুহূর্ত এগিয়ে আসে, আগামী কাল বরযাত্রীরা আসবে। মিরজার দিক থেকে কোন খবর এসে পৌঁছয় না। বীবো পিসী নিজে গিয়ে মিরজাকে সবকিছু জানিয়ে এসেছে। মিরজা বলেছিল—'সাহিবান যেন কোন চিন্তা না করে।'

বরযাত্রীরা এসে উপস্থিত হল। তাদের সঙ্গে একদল নর্তকী। নাচ গান হৈ হুল্লোরে সমস্ত গ্রাম মেতে ওঠে। কেবল সাহিবান আর বীবোর অন্তরে হৃদকম্পন হতে থাকে। মিরজার আশায় পথ চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একসময় সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হয়ে রাত্রি নামে।

ঠিক সেই সময়ে চাদরে সারা শরীর ঢেকে এক অশ্বারোহী এসে বীবোর বাড়ীর আস্তাবলে ঘোড়াকে বাঁধে। তাকে দেখে বীবোর ধড়ে প্রাণ আসে। তার স্বামী গানের আসরে গিয়েছে। অতিথিকে ঘরের মধ্যে এনে বীবো তাকে সাহিবানের দুঃখ ভাবনার কথা বলে, তারপরে জানতে চায় সে এখন কি করবে।

'ব্যাস্ মাসী, সাহিবানকে গিয়ে বল ও যেন তৈরী থাকে। ভোরবেলা মোরগের প্রথম ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন বাড়ীর বাইরে চলে আসে। দরজায় আমি ঘোড়া নিয়ে তৈরী থাকবো। সে সময়ে অন্য সকলেই ঘুমে অচেতন হয়ে থাকবে।'

সাহিবানের কাছে প্রতিটি মুহূর্ত এখন শতাব্দীর মত সুদীর্ঘকাল মনে হতে থাকে—

'যদি মিরজা না আসে তো কাল সকালে আমাকে পাল্কী চেপে যমের দোরে রওনা হতে হবে...শেষে যদি সত্যিই মিরজা না আসে, সে যদি আমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে তাহলে আমার আর বেঁচে থেকে কি লাভ ?...মিরজা যদি আমাকে নিজের করে নেয় তো আমি বাকী জীবন কয়েদখানাতে কাটাতেও রাজী আছি...' সানাইয়ের সুরের গুঞ্জন শোনা যায়। দু'হাতে নিজের হৃদয় স্পন্দন চেপে ধরে সাহিবান আর্তনাদ করে ওঠে 'হায়, হায়—মিরজা আর এলো না।' কি করে আত্মহত্যা করবে তার উপায় ভাবতে থাকে সে এবার।

বীবো এসে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। প্রিয়তমের খবর শুনে তার ক্ষণপূর্বের মৃত্যু চিন্তা বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় পল্লবিত হয়ে ওঠে।

চাঁদনী রাত অর্ধেক কেটে গিয়েছে। লোকেরা নাচগানের আসর শেষে বাড়ী ফিরে এসে শুয়ে পড়েছে। সারাদিনের হৈ চৈ আর গান বাজনার পর চারিদিক এখন নিঃঝুম নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে বিছানায় শুয়ে সাহিবান কেবল একটি বিশেষ শব্দের প্রতীক্ষায় অতন্দ্র জেগে ছিল। ক্লান্ত হয়ে পড়ার অজুহাত দেখিয়ে সে শোবার আগে বিয়ের পোষাক পর্যন্ত বদলায়নি। অদূরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ওঠে, টক-টক...টক-টক...সাহিবান উঠে চারিদিকে লক্ষ্য করে, সকলেই ঘুমিয়ে রয়েছে। সকলের ঘুমন্ত চেহারাগুলো তার দেখতে ভাল লাগে। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে একবার ভাবে, 'যদি চিরকালের জন্যে এ বাড়ীর সম্পর্ক কাটিয়ে এভাবে না যেতে হ'ত।' তারপর নিঃশব্দ চরণে দরজা খুলে বাইরে এসে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। পরক্ষণেই একটা ঘোড়া এসে তার পাশে থামে। কাপড়ে মুখ ঢাকা আরোহী রেকাব থেকে একটা পা সরিয়ে নেয়। সাহিবান রেকাবে পা দিয়ে একহাতে আরোহীর প্রসারিত হাত ধরে, অন্য হাতে জিনটা ধরে লাফিয়ে তার পেছনে চেপে বসে। নিঃশব্দ কৃতজ্ঞতা জানাতে সে দুহাত দিয়ে আরোহীর কোমর পেছন থেকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে। আরোহী মুখ নীচু করে সেই দুহাতে চুম্বন এঁকে দেয়। গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে এসে ঘোড়া ঝড়ের বেগে ছুটে চলে। মিরজার স্বপ্ন এতদিনে সত্য হল!

কিছুদূর যাবার পর মিরজার মনে পড়ে সে সাহিবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার ভাইয়েদের কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু তারা যদি পিছু ধাওয়া করে আসে তো সংঘর্ষ হতে পারে। সেকথা ভেবে মিরজা দানাবাদে যাবার সিধে রাস্তা ছেড়ে একটা ঘুরপথ বেছে নেয়।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে তারা পথের ধারে এক বাগানে এসে পৌঁছয়। একটা ঝোপের কাছে মিরজা ঘোড়া থেকে নেমে সাহিবানকে নামিয়ে তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে নেয়। মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আসন্ন বিপদের সব চিন্তা ভুলে যায় তারা। সাহিবান মিরজার কাঁধ থেকে ধনুকটা নামিয়ে নেয়, মিরজা তাতে একটা তীর লাগায়।

'এই তীর, এই ধনুক, এই ঘোড়া এই আমার দুই বাহু আর তুমি।'—মিরজা

সাহিবানের কপাল চুম্বন করে বলে—'মনে হচ্ছে সারা দুনিয়া আজ আমার হাতের মধ্যে এসে গেছে।'

'মিরজা, এখানে থামলে কেন? —চল বাড়ীতে যাই।'

'না সাহিবান, কে জানে সেখানে কি বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে? তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার আগে আমি তোমাকে একবার নিজের করে বুকের মধ্যে নেবার আকাঙ্ক্ষা মেটাতে চাই। এই কিছুক্ষণের জন্যে তুমি পৃথিবীর আর সবকিছু ভুলে যাও, আমার এই বেদনার্ত হৃদয়ের ব্যথা, এই বিরহের জ্বালা দূর করে দাও, সাহিবান।' সাহিবান এই মাটীর পৃথিবী ছেড়ে প্রেমের নিষ্পাপ দিগন্ত পেরিয়ে দুহাত দিয়ে মিরজার গলা জড়িয়ে ধরে। একটি অতৃপ্ত হৃদয়ে আর একটি হৃদয় এসে মিলিত হয়। দীর্ঘদিনের রিক্ততা, শূন্যতা দূর হয়ে যায়। মিরজার অন্তরের পাষাণভার যেন নেমে যায়, সে বলে, 'সাহিবান, এই ক্ষণিক স্বর্গসুখের মূল্য আমি জীবন দিয়েও মেটাতে রাজী আছি। আমাকে তোমার কোলে মাথা রেখে একটু শুতে দাও; তুমি বসে থেকে শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকো। মিরজা সত্যি সত্যিই শুয়ে পড়ে। দুহাত পেছনে ছড়িয়ে সে সাহিবানকে জড়িয়ে ধরে। সাহিবানের মাথা কখনো আপনা থেকেই তার মুখের ওপরে নেমে আসে, কখনো আবার মিরজা তার মাথা নিজের দিকে আকর্ষণ করে টেনে নেয়। মিরজার ক্লান্ত শরীরে প্রেমের ঝর্ণাধারা আরামের জাদুকাঠি বুলিয়ে দেয়। আবেশে তার চোখ বুজে আসে। তীর আর ধনুক তার গায়ে বিঁধছে দেখে সাহিবান সেগুলো তার গলা থেকে খুলে একপাশে সরিয়ে রাখে। ঘুমন্ত মিরজার স্বপ্নময় চোখের দিকে তাকিয়ে সে বিভোর হয়ে যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ে, লোকেরা হয়তো তাদের পিছু তাড়া করে আসছে। সামনে কোন শব্দ হলেই সে চমকে উঠে মিরজাকে জাগাতে যায়, কিন্তু সে সব অকারণ শব্দ।—'কিন্তু কারোর কাছে খবর পেয়ে তারা যদি সত্যি এদিকে আসে তাহলে?'

সাহিবান তূণের তীরগুলো গুণে দেখে। বারোটারও কিছু বেশি। সে ধনুকটাতে হাত বোলায়—কি ভয়ঙ্কর দেখতে ধনুকটা—ভায়েদের কথা তার মনে পড়ে, মিরজার অব্যর্থ নিশানার কথা হতেই তার বুক কেঁপে ওঠে।—'কিন্তু মিরজা আমাকে কথা দিয়েছে' মনে করে সে কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করে।—'কিন্তু তারা যদি এসে চড়াও হয় তাহলে মিরজা কি করে তার প্রতিশ্রুতি রাখবে? ওরা তো দলে অনেক বেশি... তীর দিয়ে কি ও পুরো দলকে তাড়াতে পারবে?' সাহিবান ধীরে ধীরে মিরজাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে—'ওঠো এবার, চলো এখান থেকে আমরা চলে যাই।'

কিন্তু মিরজা তখন বোধহয় কোন মধুর স্বপ্নের ঘোরে ছিল। সে জানতে চায়, 'কেন, কেউ এসেছে নাকি?'

'না' জবাব শুনে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। 'ভাইয়েরা নির্ঘাত এসে উপস্থিত হবে, সাহিবানের ভয় হতে থাকে, শেষে সকলেই মারা পড়বে তারা। সে ধীরে ধীরে মিরজার মাথাটা কোলের থেকে নামায়। তীরের তূণটা উঠিয়ে কিছু দূরে এক

কাঁটা গাছের পেছনের দিকে উঁচু ডালে টাঙ্গিয়ে রেখে এসে আবার মিরজার মাথাটা কোলে তুলে নেয়। 'কিন্তু ওরা যদি নিরস্ত্র মিরজাকে হত্যা করে?'—একথা ভেবে তার বুক আবার কেঁপে ওঠে। 'আমি মিরজার সামনে এসে বুক পেতে দাঁড়াবো, আমাকে আগে না মেরে ওরা মিরজার দেহ স্পর্শ করতে পারবে না। আমি যেমন ওদের মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে পারি না, ওরাই বা তবে কেন আমাকে মারার কথা ভাববে!' একথা ভাবার পর সে কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করে। সে মিরজার কপালের ইতঃস্তত: বিক্ষিপ্ত চুলের রাশি সরিয়ে চুম্বন করে।

সাহিবান এক সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পায়। 'ওরা এসে গেছে।' সকলের আগে তার ছোটভাই ছিন্দে ছিল, তাকে সে চিনতে পারে। ভয়ে তার হাত-পা অবশ হয়ে যায়। সে মিরজাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বলে, 'শিগগির ওঠো, চলো ঘোড়ার পিঠে চেপে পালাই এখান থেকে।'

'আমার তূণ—আমার তূণ কোথায় গেল? এতক্ষণ তো আমার গলায় ঝোলানো ছিল তূণটা, সাহিবান! কাউকে আমি মারবো না—ধনুকে তীর লাগিয়ে টান দিলেই ওরা ঘাবড়ে যাবে। আমার তূণ কোথায় গেল?'

'মিরজা, আমাকে ক্ষমা করো, ভাইদের মোহে আমি তোমার ওপর মোহশূন্য হয়েছিলাম, তূণটা আমি তোমার নাগালের বাইরে রেখে এসেছি, ওদিয়ে এখন আর কোন কাজ হবে না। ওরা এসে গেছে—তুমি শিগগির ঘোড়ায় চেপে পালাও।'

'না, সাহিবান, তোমাকে ফেলে রেখে আমি পালিয়ে যেতে পারবো না।' সে ছুটে গিয়ে ঘোড়ার জিন থেকে তলোয়ারটা খুলে নিয়ে আসে। 'সাহিবান, তুমি শুধু দেখে যাও, তোমার ভায়েদের কিছু হয়ে গেলে আমাকে ক্ষমা কোরো। শেষ পর্যন্ত না লড়ে আমি মরতে রাজী নই।'

সাহিবান তার গলা জড়িয়ে ধরে। মিরজা তাকে দূরে সরিয়ে দেয়—'ওরা তোমাকে কেন মারতে যাবে? তোমাকে আমার কাছ থেকে টেনে এনে আমার বুকে ছোরা বসাতে একজনের দ্বারা হবে না, দুজনের দরকার হবে। সরে যাও তুমি সাহিবান—ওরা কাছে এসে গেছে, আমাকে আমার ভাগ্যের সঙ্গে যুঝতে দাও।' মিরজা তলোয়ার বাগিয়ে ধরে। ঘোড়া থেকে সাতজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তলোয়ার ঝলসে ওঠে, সাহিবান লাফ দিয়ে তাদের মাঝে এসে দাঁড়ায়।

'এতো তাড়াহুড়ো করার কি আছে ভাইসাব, এখন তো মিরজা কিংবা আমি কেউই তো পালাতে পারবো না।'

'আমরা কারোর কোন কথা শুনতে চাই না। আমরা চোরকে হাতে নাতে ধরেছি।' এ গলার স্বর তার ভায়েদের কারোর নয়। সাহিবান তাকে চিনতে পারে না। কাল রাতে সাহিবান না পালিয়ে এলে তাহির নামে এই লোকটিই আজ তার মালিক হতো—

'আমার প্রিয় ভাইসব, তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাতে গিয়ে আমি মিরজার প্রতি অকৃতজ্ঞতা করেছি।'

'তুই আমাদের ওপর খুব কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছিস,' ছোট ভাই জবাব দেয়।

'জীবনে মাত্র সেই একবারই আমি আমার অন্তরের কথা শুনেছি, নইলে আর সব সময় তো অন্যের কথা মেনেই চলেছি—যাক সে কথা—আমি যদি ওর তীর আজ লুকিয়ে না রাখতাম তাহলে তো তোমাদের অনেকেই এতক্ষণ নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে না। আমার একটা কথা অন্ততঃ বিশ্বাস করো, আমি আমার কর্তব্যবোধের খাতিরেই এমন কাজ করেছিলাম।'

'কি চাইছিস তুই? বল্।' বড় ভাই বলে।

'একে আমরা জ্যান্ত ছেড়ে দেবো না—এ ব্যাটা আমাদের চোর!' তাহির চুপ করে থাকতে পারে না, সে মিরজার তলপেট লক্ষ্য করে তলোয়ার চালায়।

নিশানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, কিন্তু মিরজার রক্ত চড়ে যায় মাথায়, সে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'সাহিবান, এই লোকটা সম্পর্কে আমি কিন্তু তোমাকে কোন কথা দিইনি।' এক আঘাতে মিরজা তাহিরের মাথা নামিয়ে দেয়।

তা দেখে অন্য সকলে মিরজার ওপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তলোয়ারের ওপর তলোয়ার ঝনঝনিয়ে ওঠে। মিরজা তলোয়ার চালানোতেও দক্ষ ছিল। সে সকলের মার প্রতিরোধ করে চলে।

সাহিবান কাঁদতে কাঁদতে ভায়েদের পায়ে পড়তে থাকে—'আর নয় ভাই, আর নয়—আমি তোমাদের কাছে দোষ করেছি—এর সঙ্গেও প্রতারণা আমিই করেছি, আমিই ওকে ডেকে এনেছিলাম—ভাই, দোহাই তোমাদের—আর না ভাই। এবার থামো—অন্ততঃ তোমাদের বোনের মুখ চেয়ে...।' তলোয়ারের ঝনাৎকারের মধ্যে তার কাকুতি-মিনতিতে কেউ কান দেয় না। ছজনের ক্রমাগত আঘাত আটকাতে আটকাতে মিরজার হাত অবশ হয়ে যেতে থাকে। আর সে ঠিক মত মার আটকাতে পারে না—কখনো তার হাত থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরোতে থাকে, কখনো কাঁধ আঘাতে চিরে যায়, তার বুকও ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। সাহিবান আর দাঁড়িয়ে দেখতে পারে না, সে তাদের মাঝখানে বারবার এসে দাঁড়াতে থাকে।—'একে ধরে রাখ তো!' একভাই সাহিবানকে শক্ত করে ধরে রাখে। মিরজার দেহের প্রতিটি আঘাতে সাহিবানের মুখ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে থাকে। শেষে মিরজার বুকে তলোয়ারের এক প্রচণ্ড চোট লাগতে সে মাটিতে পড়ে যায়, তার হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ে।

হঠাৎ সাহিবানের দেহে বাঘিনীর শক্তি জেগে ওঠে। ভাইয়ের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে সে মিরজার সামনে গিয়ে তার তলোয়ারটা হাতে তুলে নেয়, 'এবার আমার সামনে কেউ এসো না বলছি, আমি তোমাদের সাহিবান নই, আমি এক পাগলী এখন। তোমরা মিরজাকে খুন করেছো—বেশিক্ষণ সে আর বাঁচবে না—আমি ওর সাথে যে প্রবঞ্চনা করেছি তার ক্ষমা চেয়ে নিতে দাও আমাকে।' সেই গভীর শোক এবং নির্ভীকতার কাছে স্তব্ধ না হয়ে কোন উপায় নেই। তারা দূরে

সরে যায়। সাহিবান মিরজার রক্তাপ্লুত চুল কপাল থেকে সরিয়ে তার ওরণী দিয়ে চোখের রক্ত মুছিয়ে দেয়, তার কপাল চুম্বন করে।

'মিরজা।'

'বলো, সাহিবান।'

'আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?'

'কিসের জন্য ক্ষমা! তোমার মত এক স্বর্গের পরীকে আমি স্পর্শ করেছিলাম—আমার জীবনের সব চাওয়া পাওয়া মিটে গেছে।'

'আমি তোমাকে কিছুই দিইনি, শুধু এই মৃত্যু ছাড়া।'

'উঁহু, তুমি আমাকে মৃত্যুহীন করেছো।'

'মিরজা, মুহূর্তের জন্যও কি তুমি একবার চোখ মেলে চাইতে পারবে না?'

'এ দুটো তো এখন চিরকালের জন্যে বন্ধ হতে চলেছে—তবু তুমি আমার হাতে হাত রাখলে, তুমি চাইলে তারা আঁখি মেলে থাকবে।'

সাহিবান তার হাত হাতে তুলে নিয়ে চুম্বন করে।

আমার জীবন আমি তোমাকে উৎসর্গ করছি, মিরজা। আমি শুধু চাই তুমি একবার চোখ মেলে দেখো, আমি তোমাকে প্রতারণা করিনি, যদি করে থাকি সে কেবল আমার ভাগ্যের সাথে করেছি। তুমি যেন ভেবো না, তোমার চেয়ে আমার ভায়েরা আমার বেশী প্রিয়—কেবল নিজের আনন্দের বদলে অন্যের আনন্দকে বড় করে আমার দেখার স্বভাবই আজ তোমার মৃত্যুর কারণ। আমি তোমার, শুধুমাত্র তোমারই—তোমার থেকে কেউ আর কোনোদিন আমাকে আলাদা করতে পারবে না।...' বলতে বলতে সাহিবান মিরজার উন্মুক্ত চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার হাতে মিরজার তলোয়ার। সেই তলোয়ারের হাতলে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে সে সেটা সমূলে নিজের পেটে বিঁধে দেয়। তার ভূলুণ্ঠিত দেহ মিরজার শরীরের সাথে মিলে এক হয়ে যায়।

অমৃতা প্রীতম

সস্‌সী পুন্নূ

রাজবাগানের গাছে গাছে যখন ফুল ফোটে, প্রাসাদের জানলায় দাঁড়িয়ে রাণী সে দৃশ্য দেখে উদাস হয়ে পড়েন—'হে ঈশ্বর! সমস্ত পৃথিবী ফলে ফুলে ছেয়ে গেছে কিন্তু আমার কোল কেন আজও ভরে উঠল না?'

প্রতি বছর ফুল ফোটার ঋতুতে গাছে গাছে ফুলের যে উৎসব সুরু হয় শেষে একদিন রাণীর শরীরেও তার পরশ লাগল। রাণী ফলভার নম্র গাছের ডালের মতই পূর্ণতার ভারে নত হয়ে উঠলেন। ছলনাময় আশার পাখী এতদিনে তার জানলায় এসে বসেছে। তিনি হাতে মেহেন্দীর আলপনা আঁকতে আঁকতে ভাবেন—এবার ওকে এই হাতের মধ্যে নিয়ে দানা খাওয়াবো...। আয়নার সামনে প্রসাধন করার সময় তাঁর ঠোঁটে রক্তিম খুশির গান জেগে উঠতে থাকে। আসল রেশমের দোলনাটি মুক্তোর মালা দিয়ে সাজাতে সাজাতে তিনি নিজেও প্রতীক্ষার দিনগুলোকে মুক্তোকণার মত আলাদা করে গুণতে থাকেন।

একদিন মুক্তোর মালা গাঁথতে গাঁথতে হঠাৎ মালার সুতো ছিঁড়ে যায়। সমস্ত মুক্তো মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে, দাসীরা শ্বেতপাথরের মেঝে থেকে মুক্তোগুলি তুলতে থাকে কিন্তু রাণী ছেঁড়া সুতোর মতই অসংলগ্ন ভাবনায় ডুবে যান—'শেষে আমার কর্মফলের মুক্তোও একদিন এভাবে হাত থেকে মাটিতে পড়বে না তো...'

ভম্বোর শহরের রাজা তার রাজকোষের দ্বার খুলে দিয়েছেন। দেশের লোকেরা শূন্য ঝুলি নিয়ে এসে তা ভরে নিয়ে যেতে থাকে। রাজা আর রাণী রাতে আল্লার কাছে ভিক্ষার ঝুলি পেতে প্রার্থনায় বলেন, 'হে প্রভু, আমরা দেশের রাজা, কিন্তু তোমার দ্বারে আজ ভিক্ষাপ্রার্থী। তুমি আমাদের এই ভিক্ষার ঝুলি ভরে দাও।'

শেষে দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার মত রূপবতী এক কন্যা একদিন তাঁদের ঝুলিতে এসে পড়ে। রাণী মেয়ের মুখের দিকে বারবার তাকান আর খুশিতে গান গেয়ে ওঠেন, 'এত সুন্দর তো আমি কল্পনাও করতে পারিনি।' ধমনীর রক্তধারা রাণীর বুকে দুধের ধারা হয়ে বইতে থাকে, একদিন খাবার সময় সস্‌সীর ঠোঁট বেয়ে এক ফোঁটা দুধ মাটিতে পড়ে। শুভ্র মুক্তোর মত টলটলে সেই দুধের ফোঁটা দেখে আচমকা রাণীর সেদিনের সেই মালা ছিঁড়ে সমস্ত মুক্তো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা মনে

পড়ে যায়। রাণী শঙ্কিত চিত্তে মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন কিন্তু সেদিন সারা রাত তাঁর ঘুমপাড়ানি গানের সুর কে জানে কেন বারবার কেটে যেতে থাকে!...

পরের দিন সকালে রাজাকে দরবারে গিয়ে বসতে না বসতেই প্রাসাদে ফিরে আসতে দেখে রাণী বিস্মিত হলেন। রাজা সস্‌সীর দোলনার কাছে এমনভাবে বসে থাকেন যেন দেখে মনে হয় কারুর কবরের ধারে বসে রয়েছেন।... আশঙ্কায়, ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাণী একবার মেয়ের দিকে আর একবার মেয়ের বাবার মুখের দিকে তাকাতে থাকেন। শেষে রাজা বললেন, 'আমাদের এই মেয়ে কুলের কলঙ্ক, একে নিয়ে এখন আমি কি করি? আজ জ্যোতিষীরা বলল, এ মেয়ে বড় হলে সারা দুনিয়ার থেকে আলাদা ধাঁচের হবে। কোন এক পুরুষের প্রেমে সে ঘর-সংসার লোক লজ্জা সব ত্যাগ করবে...

রাণী ছিন্ন লতার মত রাজার পায়ে লুটিয়ে পড়তে পড়তে বলেন—'চাঁদেরও তো কলঙ্ক রয়েছে...।'

'চাঁদ তারার ত্রুটি লোকে মাফ করে রাণী! কিন্তু মানুষের দোষের বেলায় করে না...'

'এও তো আমার চাঁদের কণা মেয়ে...' বলতে বলতে রাণী অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

নিজের সন্তানকে তো আর নিজের হাতে খুন করা সম্ভব নয়, তাই মন্ত্রী আর আমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজা চন্দন কাঠের একটা বাক্স তৈরী করালেন, সেটাকে হীরে জহরত দিয়ে মুড়লেন, রেশমের বিছানায় মোহর ভর্ত্তি থলি আর তার পাশে এক টুকরো রক্ত মাংসের পুঁটলির মত নিজের মেয়েকে রেখে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন—'আল্লা! মেয়েকে তোমার হাতেই তুলে দিলাম।'

রাণীর জ্ঞান ফিরতে তার মুখের ঘুম পাড়ানীর গান করুণ বিলাপে পরিণত হয়—'হায় রে বাছা! তোকে আমি এ কেমন দোলায় বসিয়ে বিদায় করলাম! কুমীরের পাল শেষে তোকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে না তো...?'

□

শহরের সীমানার বাইরে নদীর এক ঘাটে অত্তা ধোপা কাপড় কাচছিল। নদীর ভরা স্রোতে রঙীন স্বপ্নের মত কি যেন ভেসে চলেছে...

মুক্তো আর পান্না বসানো বাক্সের গায়ে সূর্যের কিরণ পড়তে সেটা ঝকমক করছিল। অত্তা ধোপা ভগবানকে স্মরণ করে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সিন্দুকের দিকে সাঁতার কেটে এগিয়ে যায়। তীরে এনে সিন্দুকের ডালা খুলে তার চোখের আর পলক পড়ে না। তার সন্তানহীন জীবনে হঠাৎ এভাবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল কি করে তা ভেবে সে কোন কূল কিনারা পায় না। ভগবান যেন না চাইতেই চাঁদের টুকরো এই মেয়েকে তার ঝুলিতে তুলে দিয়েছেন।

অত্তা কিছুতেই ভেবে উঠতে পারে না, 'কে নিজের হাতে তার এমন সৌভাগ্যকে

আজ নদীর জলে ভাসিয়ে দিল ?' গালের মধ্যে আঙ্গুল পুরে চুষতে থাকা সস্‌সীকে বারবার বুকে জড়িয়ে ধরে সে আনন্দে পাগল হয়ে যায়।

'আহা, কি সুন্দর দেখতে গো।' অত্তার বৌ সস্‌সীকে বুকে তুলে নিতে তার শুষ্ক শীর্ণ শরীরের যেন মমতার ধারা উথলে ওঠে।

শিশুর গলায় সোনার হারের সাথে বাঁধা একটা মাদুলী ছিল—অত্তা দেখল, তাতে 'সস্‌সী' লেখা রয়েছে। সেই মাদুলী আর বাক্সের হীরে জহরত সব সে একটা কাপড়ের পুটলিতে বেঁধে বাড়ীর অন্দরমহলের এক ঘরে খুব সাবধানে রেখে দেয়। 'মা মণি, এসব তোর বড় বয়েসের জন্যে তোলা রইল। বড় হয়ে তুই নিজেই এসব পরবিখ'ন।'

অত্তা মেয়ের নামে শিরণী চড়ায়, নিজের সমাজের সকলকে তার প্রসাদ বিতরণ করে। শিরণীর প্রথম থালিটা নদীর জলে উৎসর্গ করে বার বার বলে, 'আজ আমার সত্যি সত্যিই জীবন সার্থক হল, আমার ঘুমন্ত ভাগ্য এতদিনে চোখ মেলে চাইল।'

অত্তার বৌ মেয়েকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরতেই তার বিশীর্ণ স্তনে দুধের ধারা নেমে আসে। তার মনে হতে থাকে তার এতদিনের নিষ্ফল অজন্মা শরীরে হঠাৎ এক স্বর্গীয় ফুল পাপড়ি মেলে ধরেছে। এমনিভাবেই রাজপ্রাসাদের আনন্দ ধোপার উঠোনে খেলে বেড়াতে লাগল।

□

সস্‌সীর রূপ যৌবন যেন বন্যার স্রোতের মত দুকূল ছাপিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। আত্মীয় কুটুমদের কাছ থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসতে সুরু করে। অত্তা তার মেয়ের রূপের দিকে তাকিয়ে মোহিত হয়ে যায়। সে ভাবে, 'এ মেয়ের জন্যে দেবদূত খুঁজে আনতে হবে। এর যোগ্য মানুষ তো আজও আমার চোখে পড়ল না...

যে সব আত্মীয় কুটুমেরা এতদিন নিজেদের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে অত্তাকে খোশামোদ করছিল তারা বলতে শুরু করে—অত্তার মেয়ে ডানাকাটা পরী, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, তার জন্যে কোন রাজা বরযাত্রী হয়ে আসবে তার দোর গোড়ায়।

সস্‌সীর রূপের খ্যাতি ক্রমশ চারধারে ছড়িয়ে পড়ে। পাঁচ কান হতে হতে সে কথা গরীবের আস্তানা ছাড়িয়ে দেশের মন্ত্রী আর আমলাদের কানে গিয়ে পৌঁছয়। তাদের মধ্যে কেউ রাজার কানেও কথাটা তোলে—'অত্তা ধোপার মেয়ে তো প্রাসাদে থাকার যোগ্য।' রাজা অত্তাকে ডেকে পাঠাতে সে মনে মনে প্রমাদ গোণে—'হে ভগবান, এতদিন বাদে এ আবার কি বিপত্তি দেখা দিল ?' কিন্তু রাজার হুকুম, অমান্য করার উপায় নেই।

অত্তার বৌ সস্‌সীকে তিল-সর্ষে বাটা দিয়ে ঘষে মেজে চান করাল আর

জামা কাপড় পরিয়ে সাজাবার সময় আপদে বিপদে রক্ষার কথা ভেবে তুলে রাখা সেই সোনার মাদুলিটা গলায় দিয়ে দেয়।

অত্তা মেয়েকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে আসতে সস্‌সীকে দেখে রাজার আর চোখের পলক পড়ে না। তিনি ভাবেন, 'এমন রূপ তো সচরাচর রাজবাড়ীর ভাগ্যেও জোটে না, এ ধোপা একে কোথা থেকে কুড়িয়ে আনলে...?' রাজা এমন ভাবে ছুটে গিয়ে সস্‌সীর হাত ধরলেন যে মনে হল যেন পায়ের তলার মাটী তাঁর মখমল বিছানো। কিন্তু যেই তার কাঁধে হাত রাখতে যাবেন অমনি গলার মাদুলির দিকে নজর পড়ে। রাজার পায়ের তলার মাটি এবার টলতে থাকে...রাজা অন্দরমহল থেকে রাণীকে ডেকে পাঠিয়ে সস্‌সীর গলার সেই মাদুলি দেখালেন। 'মা মণি আমার...আমার বাছারে...' রাণী কম্পিত কণ্ঠে ডেকে ওঠেন। রাজার অন্তরেও তোলপাড় হতে থাকে, কিন্তু সস্‌সীর চেহারা দেখেও তিনি কিছুতেই সম্পূর্ণ সন্দেহ মুক্ত হতে পারছিলেন না—নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া তার আদরের ধন আজও এ সংসারে বেঁচে আছে? রাণীর মনে হল এ যেন বাস্তব সংসারের কোন ঘটনাই নয়—তিনি ভয়ে চোখের পলক ফেলতে পারেন না পাছে সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্নের মত মিলিয়ে যায় শেষে।

রাজা অত্তা ধোপাকে কাছে বসিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে আদেশ দিলেন।

'হুজুর, জাঁহাপনা! এ আল্লার দয়া। তিনিই আমার শূন্য ঝোলা ভরে দিয়েছেন। হীরে মুক্তো বসানো সিন্দুকের ভেতরে রেশমের পুঁটুলীর মত মেয়েটি রাখা ছিল আর সিন্দুকটা নদীর জলে ভেসে যাচ্ছিল...' অত্তা ধোপা জোড় হাতে দাঁড়িয়ে সব কথা বলে শেষে পা জড়িয়ে ধরে, 'এ মেয়ে জলকন্যার মত জল থেকে উঠে এসেছিল মহারাজ। ওপরে খোদাতালার ভরসা আর নীচে হুজুর মা-বাপ, নইলে আমার আর কি ক্ষমতা বলুন যে, এমন অপ্সরা আমার উঠোনে খেলা করতে আসবে...'

কৃতার্থ রাজা দেবতাকে অঞ্জলী দেবার মত অত্তাকে একশ একটী মোহর উপহার দিলেন এবং মিনতির সুরে বললেন, 'ভগবানেরই লীলা খেলা অত্তা! জায়গা জমি তুই যা চাস আমি তোকে দেবো, কিন্তু আমার এই প্রাসাদের আলোর কন্যাকে তুই আমায় ফিরিয়ে দে...।' রাণীর অন্তরে নতুন আশা জাগে, তিনি বলেন, 'আমি তোর উপকার কোনদিন ভুলতে পারবো না, অত্তা। তুই এই অভাগা মায়ের ভাগ্যকে ফিরিয়ে দে।' অত্তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে। সে কোন কথা বলতে পারে না। তার হয়ে সস্‌সী জবাব দেয়—"রাণী মা! আপনি যখনই আদেশ করবেন, আমি আসবো। কিন্তু যে আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে আশ্রয় দিয়েছে, আমি তার কাছেই থাকবো।'



প্রাসাদের আনন্দ আবার ধোপার বাড়ীর উঠোনেই খেলা করতে থাকে। এতদিন

শুধু বিধাতাই জানতেন, এখন দুনিয়ার সবাই দেখল সস্‌সী নদীর তরঙ্গের মতই অবাধ স্বাধীন, তার খুশিমত সে ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। রাজা সস্‌সীর জন্যে একটা আলাদা বাগান তৈরী করে দিলেন। সস্‌সী সেখানে তার সঙ্গীদের নিয়ে দোলনায় দোলে আর গান গেয়ে বেড়ায়। প্রস্ফুটিত ফুলের মতই দিন দিন সস্‌সী রূপে গন্ধে ভরে উঠতে থাকে।

সস্‌সীর এখন আর কোন ভাবনা চিন্তা থাকে না, সব কিছুই এখন তার অনুকূলে। জ্ঞানীগুনী শিক্ষকেরা সস্‌সীকে পড়াতে আসেন, সে পড়াশোনায় মন দেয়। সারা রাত প্রদীপের আলোয় সে তার অন্তরের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করতে উঠে পড়ে লেগে যায়।

গজনীর এক সওদাগরও নাকি সে সময়ে শহরে এক বাগান তৈরী করেছিল এবং তার বাগান বাড়ীতে সে এমন সুন্দর সুন্দর সব ছবি তৈরী করেছিল যে তেমন ছবি আজ পর্যন্ত কেউ দেখা দূরে থাক, শোনেওনি।

সস্‌সীর সে সময়ে সবকিছু জানবার প্রচণ্ড আগ্রহ। বন্ধুদের নিয়ে সে গজনীর সওদাগরের বাগানে গিয়ে উপস্থিত হল। দেখে শুনে সস্‌সীর মন খুশিতে নেচে ওঠে—যুগপৎ দুটি ভিন্ন সুবাসে সারা বাড়ী যেন ভরপুর। একদিকে ফুলের সুগন্ধ, অন্যদিকে রঙের সুবাস; বাইরে মালী বাগানের কেয়ারীতে গাছের চারা লাগাচ্ছিল আর ভেতরে এক চিত্রকর নানান রঙে ছবি আঁকছিল।

সস্‌সী ছবি দেখে আর তারিফ করতে থাকে। ছবির মধ্যে একটা ছবি দেখে সস্‌সীর আর পা সরে না। চোখের পলক ফেলতেও ভুলে যায় সে। বন্ধুরা এসে ধাক্কা দিয়ে সচেতন করতে সে চিত্রকরের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বলে—'যাদুকর, তুমি এই ছবিটা কার চেহারা দেখে এঁকেছিলে?'

চিত্রকর হেসে ফেলে—'চেহারা তো ভগবান সৃষ্টি করেছেন, ছবিটা বানিয়েছে এ অধম। এ হল কীচম দেশের রাজা অলীহোতের রাজকুমার পুন্নূ...'

'পুন্নূ...পুন্নূ...' সস্‌সীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে বেজে ওঠে সে নাম।

জ্ঞান আহরণ করতে এসে সস্‌সী শেষ পর্যন্ত তার নিজের ভাগ্যই সওদা করে বসল। সমস্ত হৃদয় মন মূল্য হিসেবে ধরে দিয়ে সস্‌সী পুন্নূর সেই ছবি মানস চক্ষে গেঁথে নিয়ে ফিরে এল।

ভম্বোর শহরের সব হাকিমই সে সময়ে সস্‌সীর আজ্ঞাধীন। সস্‌সীর আদেশে নদীর সব ঘাটে পাহারাদার বসল—শহরে নতুন কোন সওদাগর এলেই তাকে প্রথমে যেন সস্‌সীর কাছে হাজির করা হয়। 'সওদাগরদের ধনে-প্রাণে কোন অনিষ্ট হবে না, তবে যতক্ষণ না তারা রাজা অলীহোতের কুমার পুন্নূকে এখানে না আনতে পারবে ততদিন তারা কেউ নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবে না।' সস্‌সীর এই আদেশ শুনে সওদাগরদের মধ্যে সোরগোল সুরু হয়ে যায়। তারা এক সওদাগরকে দূত হিসেবে কীচমে পাঠায়। রাজা অলীহোত সেকথা শোনার পর সারা

বালুচিস্থানের লোকেরা ক্ষেপে ওঠে। সেই রাগের কথা পুন্নূ্র কানেও পৌঁছয় এক সময়। সে দূতকে একান্তে ডেকে এনে তার কাছ থেকে সস্সীর প্রেমের কথা সব শোনে। সস্সীর অন্তরের প্রেমের আগুন পুন্নূ্র হৃদয়কেও স্পর্শ করে। তার শরীরের অণু-পরমাণু সস্সীর প্রেমে উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে।

সকালের রক্তিম সূর্যকে দেখে সেদিন পুন্নূ্র মনে হল, এযেন অন্যদিনের সূর্য নয়, সস্সীর প্রেমই যেন সূর্য হয়ে পূর্ব-দিগন্তে উদিত হয়েছে।

পুন্নূ্ সেই উদিত সূর্যকে নত হয়ে অভিবাদন জানায় এবং আতর এবং অন্যান্য সুগন্ধি মালপত্র নিয়ে সওদাগরের বেশে বাবাকে না জানিয়ে ভম্বোরের উদ্দেশ্যে একদিন রওনা হয়ে পড়ে।

□

'কীচম থেকে সওদাগর এসেছে।' পাহারাদারের কাছে এ খবর পেয়েই সস্সী কীচমের সওদাগরেরা নানান মালপত্র নিয়ে হাটের যেখানে শামিয়ানা খাঁটিয়ে বসেছে সেখানে ব্যাকুল হয়ে ছুটে যায়। সেই সওদাগরদের ভীড়ের ভেতর পুন্নূ্ও সওদাগর সেজে বসেছিল। সস্সী তাকে চিনতে পারে না। কিন্তু পুন্নূ্র সস্সীকে দেখে মনে হল—যে সূর্যকে আকাশে দেখে সে অভিবাদন করেছিল সেই সূর্যই যেন তার সামনে মাটিতে নেমে এসেছে।

পুন্নূ্ আতরে ভেজানো তুলো হাতে সস্সীর কাছে গিয়ে এমনভাবে তার আঁচলের প্রান্তে আতর লাগায় যেন হজরতের দরগায় সে আতর ভেট দিচ্ছে।

'কেবল আমার মালিকের জন্যে!' পুন্নূ্র এই অভিবাদন শুনে সস্সীর চোখের তারায় বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করে—"সওদাগর, তুমি ভাগ্যশালী দেশ থেকে এসেছো—একটা কথা সত্যি করে বলবে—তুমি আমার পুন্নূ্কে কখনো দেখছো কি?'

পুন্নূ্ সসম্মানে মাথা নত করে বলে, 'হ্যাঁ।' তারপরে মাথা তুলে সস্সীর চোখে চোখ রেখে বলে, 'হে স্বর্গের লাবণ্যময়ী! আসল পুন্নূ্কে আমি আজই প্রথম দেখলাম তোমার চোখের তারায়।'

দুজনের মাথাই একে অন্যের সামনে অভিবাদন মুদ্রায় নত হয়।

□

এদিকে পুন্নূ্র ভায়েরা খুবই রেগে যায়, তারা উটের পিঠে চেপে পুন্নূ্র আসবার কয়েকদিনের মধ্যেই ভম্বোরে এসে উপস্থিত হল। তারা দেখল, সারা শহর ঝাড় লণ্ঠের উজ্জ্বল আলোর মত আলোয় ঝলমল করছে। নানান কথাবার্তা শুনতে শুনতে তারা সস্সীর বাগানে, যেখানে পুন্নূ্ এসে উঠেছে, সেখানে উপস্থিত হল। ফুলের জলসায় সস্সীর সখীরা পাখীর মতই আনন্দ কলরব গুঞ্জনে মেতেছিল।

পুন্নূ্র ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে উটগুলোকে বাগানের বাইরে

গাছে বেঁধে রেখে ভেতরে এসে সস্‌সী আর পুন্নূর সঙ্গে প্রিয় ব্যবহার করে। স্বরে মধু ঢেলে তারা বলে—'আমরা ভাইয়ের আনন্দের সাথী হতে এসেছি।'

'হে প্রিয়ভাষীগণ, আপনাদের আতিথ্যে যাতে কোন ত্রুটি না হয় তার জন্যে আমি আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকবো' এই বলে সস্‌সী তাদের খাওয়াদাওয়ার জন্যে কালীয়া পোলাওয়ের ব্যবস্থা করতে সুরু করে।

সন্ধ্যেবেলা পুন্নূর ভাইয়েরা সুরাপাত্র বার করে জানাল—'বিয়ের আগের তিনদিন আমরা মেহফিল বসাতে চাই।'

সস্‌সীর সখীরা মেহেন্দী রঙ গুলে, আতর-সুবাস ঢেলে অঙ্গ-প্রসাধন তৈরী করে সস্‌সী আর পুন্নূকে খাঁটি রেশমের জামাকাপড়ে সাজিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে।

রাজবাড়ী থেকে রাণীমা থালা ভরে মুক্তো পাঠান। আর অত্তা ঝুড়ি ভর্তি নারকেল-সোহারা এনে পুন্নূর ভাইদের ভেট দেয়।

অত্তার আত্মীয় কুটুমেরা নদীর ঘাটে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালায় এবং পীরের দরগায় শিরণী মানত করে।

এমন আনন্দের দিনে লোকে পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করে কিন্তু পুন্নূর ভাইয়েরা পাপের রাস্তায় পা বাড়াল। পুন্নূর শেষ সুরার পাত্রে তারা ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয়। বিয়ের আগে শেষ এক পাত্র সুরাপানের রীতি থাকায় পুন্নূ কোন রকম সন্দেহই করেনি। কিন্তু পাত্র খালি হতে না হতেই পুন্নূর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। সস্‌সী তার সাথীদের সাথে তার নিজের তাঁবুতে শুতে চলে আসে, আর পুন্নূ তার ভাইয়েদের সাথে তার তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

রাতের অন্ধকার যখন প্রভাতের সূর্যের কাছে সবে মাত্র বিদায় নিতে চলেছে, ঠিক সেই সময়ে সস্‌সীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। পুন্নূর তাঁবু হাট করে খোলা, ভেতর শূন্য। মাঝরাতে বেহুঁশ পুন্নূকে উটের পিঠে তুলে নিয়ে তার ভাইয়েরা কীচমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে।

মুহূর্তে সেই উৎসববাসর সস্‌সীর কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। উটের দল যে পথে পুন্নূকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে সস্‌সী পাগলের মত সেদিকে ছুটতে থাকে।

তার বান্ধবীরাও চোখের জল ফেলতে ফেলতে তার পেছনে ছোটে। কিন্তু পাগলিনী-প্রায় সস্‌সীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা পেরে উঠবে কি করে? উটের পায়ের চিহ্ন খুঁজতে খুঁজতে নগ্ন পায়ে সে যে কোথায় মিলিয়ে গেল কে জানে।

'পুন্নূ। পুন্নূ!' সস্‌সীর আর্তনাদ মরুভূমির দিক্‌দিগন্তে ভেসে বেড়াতে থাকে। সস্‌সীর পায়ের চেটোর মেহেন্দীর রঙ ক্রমশ রক্তের মত লাল হয়ে ওঠে। মাথার ওপরে সূর্য তার প্রেমের বহ্নির মতই জ্বলতে থাকে—মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রজ্বলিত অগ্নিস্তম্ভের মত সস্‌সী উত্তপ্ত মরুভূমিতে ছুটতে থাকে।

রাণীমার পাঠানো মুক্তোর মালাটা সস্‌সী গলায় পরেছিল—তার খোলা চুলের সাথে জড়িয়ে কে জানে কখন সেই হারের সুতোটা ছিঁড়ে যায়। ঝরঝর করে

মুক্তোগুলো মরুবালুতে ছড়িয়ে পড়ে। তার নিজের ভাগ্যের সেদিনের কথা মনে পড়ে—তার জন্মের আগে তার মা দোলনা সাজানোর জন্যে মুক্তোর মালা গাঁথছিল, সে মালাও ছিঁড়ে গিয়েছিল...

রাণীমার মুখে শোনা এই ঘটনার কথা তার মনে আসতেই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে—'আমার ভাগ্যকে মা সে সময়েই চিনে নিতে পেরেছিল...'

পায়ের ফোস্কার যন্ত্রনার মধ্যেও সস্‌সী বালির মধ্যে পড়ে থাকা মুক্তোগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর আবার উটের পায়ের চিহ্ন খুঁজতে শুরু করে।

সস্‌সীর সীমাহীন ভাবনার মতই মরুভূমির এই বালুরাশি অপার, অসীম।

'আমি জল ও স্থলের গচ্ছিত সম্পদ!'—সস্‌সী ব্যাকুল হয়ে নিজেকেই নিজে বলে—'অথৈ জল একদিন আমাকে অন্যের গচ্ছিত সম্পদের মত দুহাতে ধরে রেখেছিল, আজ এই মরুভূমিও আমাকে প্রেমের গচ্ছিত ধন হিসেবে সাবধানে রাখবে...'

সস্‌সী জ্ঞানী-গুণীদের কাছে শুনেছিল, এক ধরণের পাখী (কুকনুস) আছে তারা গান গাইলে তাদের ডানা থেকে আগুনের শিখা জ্বলে ওঠে। গানের গতির সঙ্গে আগুনের শিখাও বাড়তে থাকে এবং একসময় তারা নিজেদের ডানার আগুনেই পুড়ে নিজেরা ভস্ম হয়ে যায়।

সস্‌সীর এবার মনে হতে থাকে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে যেন আগুনের তাপ বেরোচ্ছে। সে আরো জোরে জোরে চীৎকার করে ডাকে—'পুন্নূ... ! পুন্নূ... !'

তার শরীর এবার তার নিজের দেহের উত্তাপে পুড়ে যেতে থাকে।

কাছেই এক টিলার আড়ালে এক রাখাল বালক একপাল ভেড়া নিয়ে যাচ্ছিল। তার কানে সস্‌সীর সে আর্ত চীৎকার গিয়ে পৌঁছয়। টিলার পেছন থেকে বেরিয়ে সেই গরম বাতাস যেন সাঁতরে এসে যেখানে জড়োয়ার কারুকার্য করা ওড়নাটা শবাচ্ছাদন বস্ত্রের মত পড়ে ছিল, সেখানে পৌঁছয়।

'হায় ভগবান!' রাখাল ছেলেটি ওড়নাটা একটু সরিয়ে দেখে, সস্‌সী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

রাখাল ভেড়ার পিঠে রাখা ভিস্তি থেকে জল নিয়ে সস্‌সীর গায়ে ছিটোয়।

ক্ষণিকের জন্যে সস্‌সীর জ্ঞান ফিরে আসে এবং এক ঢোক জল খাওয়ার মতই সে শেষ একবার 'পুন্নূ...পুন্নূ...' বলে ডেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

রাখাল ছেলেটি বহুক্ষণ চুপ করে তার সামনে বসে থাকে। শেষে বিকেলের সূর্য পাটে যেতে বসলে সে সেখানেই বালির মধ্যে সস্‌সীর জন্যে কবর খুঁড়তে আরম্ভ করে।

যুবক মেষপালকের মনে এক অপার বৈরাগ্যের ভাব জাগে। সে মনে ভাবে এই অপ্সরার মত সুন্দরী রমণীর কবরে সে আজীবন প্রদীপের শিখার মত নীরবে জ্বলতে থাকবে...

সন্ধ্যার অন্ধকার সবে নেমেছে, এমন সময় উটের পিঠে সওয়ার এক যাত্রী পাশ-

দিয়ে যাবার সময় তাকে সেখানে বসে থাকতে দেখে দাঁড়ায়। সে জিজ্ঞাসা করে, 'ভাই, এখানে কোথাও একটু জল পাওয়া যাবে কি?'

যে জলের পাত্র থেকে রাখাল সস্‌সীকে জল দিয়েছিল, সেই পাত্রটাই তাকে এগিয়ে দেয় সে।

যাত্রী এক চুমুক জল খেয়ে একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, 'ভাই, এই মরুভূমির মাঝখানে কোন আড়াল নেই, রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সামান্য ছায়াও নেই, তবু তুমি কেন এখানে বসে আছো?'

রাখাল হাতের ইশারায় কবরটা দেখিয়ে বলে, 'আমার জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা ধরে গেছে, একটু আগেই আমি এখানে এক অপরূপ সুন্দরী রমণীকে মরতে দেখলাম...'

'কে সে?' যাত্রীর হাতে জলের পাত্রটা কেঁপে ওঠে।

'কে তা সে আমি জানি না—পুন্নু, পুন্নু বলে ডাকতে ডাকতে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।'

আগন্তুক যাত্রী তার কম্পিত হাত রাখালের কাঁধে রেখে অনুরোধ জানায়—'তাহলে ভাই, তুমি আর একটু আমার উপকার করো। এই কবরটাকে আর এক-বার খুলে একটু বড় করে খুঁড়ে দাও।'

রাখাল ছেলেটি অবাক হয়ে উটের পিঠের মুসাফিরের দিকে তাকায়, কিন্তু সে তাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই উটের পিঠ থেকে নেমে কবরের বালি সরাতে শুরু করে।

কবর উন্মুক্ত করে প্রথমে সেই যাত্রী সস্‌সীর মৃতদেহকে মাথা নত করে সম্মান জানায় তারপর তার নিজের পোষাক খুলে তার পায়ের কাছে রেখে বলে—'আমার ভায়েরা প্রতারণা করেছিল, সস্‌সী! আমার জ্ঞান হতেই আমি আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে ফিরে এসেছিলাম...'

তারপর পুন্নু যে ছোরার জোরে ভাইদের সঙ্গে লড়াই করে ফিরে এসেছিল সেই ছোরাটা নিজের বুকে আমুল বিদ্ধ করে সস্‌সীর কবরের মধ্যেই ঢলে পড়ে।

বিস্মিত রাখাল হতবাক হয়ে যায়। বালি দিয়ে কবর ঢাকতে ঢাকতে সে কবরের প্রদীপ শিখার মতই কাঁপতে থাকে...।

কর্তার সিং দুগ্গল

সোহনী মহীওয়াল

পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভগা ও বিতস্তা। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় তিনটি নদী ওদিকের ভাগে চলে যায় আর আমাদের ভাগে পড়ে দুটি নদী, শতদ্রু আর বিপাশা। তিনটি নদী নিয়ে যে অংশটা পাকিস্তানের দিকে তারাও সেটাকে পাঞ্জাব বলে এবং দুটো নদী নিয়ে যে টুকরোটা হিন্দুস্তানের ভাগে রয়েছে সেটাকে আমরাও পাঞ্জাব বলি। কে জানে হয় তো এই আশায় যে বিভেদের এই নকল রেখাটা শ্লেটের পাতে খড়ির দাগের অঙ্কের মত মুছে যাবে আর একদিন সমগ্র পাঞ্জাব নৃত্যের ধ্বনিতে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবে।

পাঞ্জাবের এই নদীগুলির মধ্যে চন্দ্রভগা সব থেকে বেশি আলোচিত নদী, বিশেষ করে পাঞ্জাবী লোক সাহিত্যে। লোক-গীতি আর গল্প-উপকথায় চন্দ্রভগাকে অনেক ক্ষেত্রে ঝণাঁ নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। শোনা যায় তার জলের প্রভাব নাকি এমনই, একবার যে তার স্বাদ নিয়েছে সে কিছুতে সুস্থির হয়ে জীবন কাটাতে পারে না—দেশের দশের কোন কাজেরই আর উপযুক্ত থাকে না। এই ঝণাঁ নদীর তীরে কবি দামোদরের চোখের সামনে হীর আর রাঞ্ঝার বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হয়েছে। এই ঝণাঁর তীরেই মিরজা আর সাহিবান প্রেমের দোলনায় দোল খেতে খেতে অনেক ওপরে উঠেছে এবং শেষে একদিন মুখ থুবরে পড়েছে। এই ঝণাঁর জলেই সোহনী আর মহীওয়ালের কাহিনী লেখা হয়েছে রক্তরেখায়।

□

এ গল্প সেই সময়ের যখন ভারতবর্ষকে বিশ্বের সব দেশ সোনার পাখী হিসেবে দেখতো। দেশ দেশান্তর থেকে সওদাগরেরা নানান পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসতো। তারপর বেচা কেনার শেষে ভারতের পণ্য ভার নিয়ে ফিরে যেত দেশে। আরবী ঘোড়ার ব্যাপারী বুখার দেশের এক সওদাগরকে নিয়ে এ গল্পের সুরু। সেবারের যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ইজ্জতবেগ নামে এক ধনীর ছেলে এসেছিল। ইজ্জতবেগ ছিল ঘোড়ার প্রেমে পাগল।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে নানান অদ্ভুত ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়ে ক্রেতাদের সে চোখ

ধাঁধিয়ে দিত। সওদাগরের ঘোড়া দ্বিগুণ-চারগুণ দামে বিক্রী হয়ে যেতো। সেবার ঘোড়া বেচতে বেচতে তারা গুজরাতের এক শহরে এসে পৌঁছয়। তাদের কাছে ঘোড়া বলতে তখন কেবল তাদের নিজেদের ব্যবহারের ঘোড়াগুলো। সে ঘোড়ার পিঠে চেপেই তারা দেশে ফিরে যাবে। লাহোর, দিল্লী, আগ্রা এবং অন্যান্য কিছু শহর ইতিমধ্যে তারা ঘুরে এসেছে। প্রচুর লবঙ্গ, এলাচ, পেস্তা কিসমিস প্রভৃতি বিক্রী-বাটা করেছে।

সে সময় গুজরাতের মাটির বাসনের খুব খ্যাতি ছিল। তুলা নামে এক কারিগরের বিশেষ নাম-ডাক ছিল। তার তৈরী বাসনপত্র দেশ-বিদেশে চালান হত। এমন কুঁজো সে বানাতো যে তার গলা দিয়ে উছলে পড়া জল কাচের মত স্বচ্ছ দেখা যেত। তার তৈরী বাটি, ফুলদানী, থালা, রেকাবি, কুঁজো, কল্কে ইত্যাদি দেখে দেখেও খরিদ্দারদের আশ মিটতো না। কোথা থেকে যে মাটি আনতো, কেমন ভাবে যে মাটি মাখতো আর কেমন করেই বা চাকায় রেখে ঘোরাতো তা জানত না কেউ; নিজের এই গুপ্তরহস্য সে কারুর কাছে ফাঁস করতো না। তার বাসনপত্রে রঙ-বেরঙের আঁকা ছবির কোন তুলনাই ছিল না। কয়েক পুরুষ ধরেই বংশপরম্পরায় তারা এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। লোকেরা বলাবলি করতো—অন্যসব কাজ তুলা কুমোর করলেও ছবি আঁকতো নাকি তার মেয়ে সোহনী—চাপার কলির মত তার আঙুলের গড়ন, তার রূপের গল্প তো শহরের অলিতে গলিতে রূপকথার মত ছড়িয়ে ছিল। সোহনী পড়াশুনাও করেছিল প্রচুর।

সেদিন ইজ্জতবেগ ঘুরতে ঘুরতে তুলার বাড়ীতে গিয়ে হাজির। বাড়ীর উঠোন যেন এক বিরাট সাজানো গোছানো কারখানা। শতশত মজুর কারিগর সেখানে কাজ করছে। ঘর দালান সব মাটির বাসনপত্রে ভর্তি। তুলা কুমোরের কারিগরীর নমুনা দেখতে দেখতে ইজ্জতবেগ বিস্মিত হয়ে যায়। প্রতিটি বাসনই যেন একে অন্যের থেকে আরো বেশি সুন্দর—প্রতিটি ছবি যেন আরো বেশি অনুপম। রঙের নিপুণ ব্যবহার দেখে তার দুচোখ জুড়িয়ে যায়। বাইরে কিন্তু দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আসতে থাকে।

বুখারের আমীরের ছেলেকে তুলা নিজে খাতির করে মাটির পাত্র দেখাতে থাকে। এ দালান থেকে সে দালান, এ ঘর থেকে সে ঘরে ঘুরে ঘুরে তারা জিনিষপত্র দেখছিল। এক সময় তারা বাড়ীর ভেতর মহলে পৌঁছয়। সেখানে তুলা তার সব থেকে ভাল মাল জমা করে রেখেছিল। সে সব মাল কেবল ধনীরাই কিনতে পারে।

ভেতরের মহলে পা দিতেই ইজ্জতবেগ পর্দার আড়ালে চৌকিতে বসে থাকা তুলার মেয়ে সোহনীকে এক ঝলক দেখতে পায়। সে একমনে একটা পেয়ালায় ছবি আঁকছিল। সেই এক পলকের একটু দেখাতেই বিস্মিত ইজ্জতবেগের হাত ফসকে একটা ফুলদানী মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। ফুলদানী ভাঙার শব্দে চমকে উঠে তুলি হাতে ঘোমটা বিহীন মাথায় বাইরের ঘরে যে ছুটে আসে, সে সোহনী। সামনে দাঁড়িয়ে ইজ্জতবেগ। দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ প্রসন্ন চেহারা তার, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা

ঘন কালো চুল। আর ওদিকে সোহনী যেন স্বর্গচ্যুত এক অপ্সরা। উদ্বেগে মুখ রক্তিম। তাড়াতাড়িতে আসার জন্তে কপালে গালে অবিন্যস্ত চুলের গুচ্ছ ছড়িয়ে রয়েছে। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীটি দেখে মনে হয় কোন চিত্রকর যেন আশ্চর্য সুন্দর একটা ছবি রচনা করে গেছে। এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট কেটে যায় নিঃশব্দে। শেষে তুলা গলা খাকরি দিয়ে মাটি থেকে ভাঙ্গা ফুলদানীর টুকরোগুলো কুড়োতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সেদিনের পর থেকে ইজ্জতবেগ রোজই তুলার বাড়ীতে যেতে সুরু করে আর মাটির বাসনপত্র পছন্দ করে কিনতে থাকে। তুলার বেশ কয়েকটা দালান আর কামরার মাল খালি হয়ে যায়। একদিন ইজ্জতবেগ যে সময়ে এসে উপস্থিত হল তখন তুলা বাড়ীতে নেই। কোন এক আত্মীয়ের মৃত্যুর সংবাদ পেঁয়ে সে সেখানে গিয়েছিল। বাবা বাড়ীতে নেই, এমন নামী কেউকেটা খদ্দেরকে সোহনী নিজেই শেষে বাসন দেখাতে সুরু করে। সেদিন সারা দুপুর ধরে ইজ্জতবেগ বাসন কেনে। দুপুর শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামে। তারপর কোথা দিয়ে যে কি হল কেউ জানে না, বাসন বেচতে বেচতে সোহনী শেষে নিজেকেই হারিয়ে বসল। সোহনীর মনে হল, সেই বিদেশীর হাতের স্পর্শে মাটির রঙীন পাত্র যেন অন্য এক বিচিত্র রঙে অপরূপ হয়ে উঠছে। এমন রঙ সে আগে কখনো দেখেনি। প্রিয়তমের সামান্য এক স্পর্শেই সোহনীর মনে হল ঘরের আবহাওয়া যেন মধুর শীতল হয়ে গিয়েছে। বাইরে তখন তীব্র গরম অথচ ঘরের ভেতরে এমন শীতল শিহরণ! শুধুমাত্র রাঞ্ঝার স্পর্শেরই অপেক্ষা ছিল, সোহনীর অন্তরের হীর যেন ফুলের মত বিকশিত হয়ে ওঠে। সমস্ত পরিবেশ যেন গানের মূর্ছনার ভরে যায়।

ওদিকে ইজ্জতবেগের সঙ্গীরা ভাবনায় পড়ে। সমস্ত টাকা পয়সা সে মাটির বাসন কিনে নষ্ট করে ফেলেছে। বাসনের একেবারে পাহাড় জমে গেছে। দু-চারটে বাসন হলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু এই এত বাসন দূর বুখারে বয়ে নিয়ে যাওয়াও এক সমস্যা। তাছাড়া ইজ্জতবেগের শহর ছেড়ে যাবারও কোন উচ্চবাচ্য নেই। সরাইখানায় পড়ে থাকা বাসনে ধুলো জমতে থাকে। সঙ্গীরা ইজ্জতবেগের ব্যাপার-স্যাপার কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। শেষে একদিন বিরক্ত হয়ে তারা সকাল বেলা দেশে ফেরার জন্য রওনা দিল। ইজ্জতবেগ সঙ্গী হল না তাঁদের।

এখন সমস্ত দিন ইজ্জতবেগের শুধু একটাই কাজ—তুলার কারখানায় ঘুরে বেড়ানো। কখনো কুমোরদের চাকার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনো যেখানে বাসনগুলো পোড়ানো হচ্ছে সেখানে, কখনো বা জিনিষপত্রের দর-দস্তুর করে। আর তার মধ্যে যদি একবার সোহনীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তবে মনে হয় দিনটি সার্থক হল।

ওদিকে সোহনীর অবস্থাও শোচনীয়—অপরিচিত বিদেশীর একবারমাত্র স্পর্শেই তার নিজের সমস্ত কিছু এখন তার পর বলে মনে হয়। খাওয়া দাওয়ায় রুচি নেই, সারাদিন বসে বসে কেবল বাসনে রঙ করে। আর সব কিছুতেই সেই এক নীল রঙ, যা তার প্রেমিকের পছন্দ। সেই এক ছবি, যা ইজ্জতবেগ ভালবাসে।

তুলা মনে মনে সবকিছুই অনুভব করে। সব কিছুই বুঝতে পারে সে পরিষ্কার। কিন্তু মুখ ফুটে সে কিছু বলে না। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়ে। সে সোহনীর বিয়ের অন্যত্র যথেষ্ট চেষ্টাও করে কিন্তু সোহনী কিছুতেই রাজী নয় সে প্রস্তাবে। নিজের একমাত্র মেয়েকে প্রাণ ধরে সে এক বিদেশীর হাতে তুলে দিতে পারে না, এটাই তার একমাত্র মুশকিল।

দলবল চলে গেছে প্রায় দিন সাতেক হল। ইজ্জতবেগের কাছে এখন আর কিছুই নেই ময়লা ছেঁড়া জামা কাপড় ছাড়া। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, ইজ্জতবেগ এখন পয়সার জন্যে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। ঘোড়ার দেখাশোনা করা ছাড়া সে আর কোন ধরণের কাজ জানতো না। এই শহরের লোকেদের ভাষাও সে জানে না, শেষে অনেক ভেবেচিন্তে সে রাখালের (মহীওয়ালের) কাজ শুরু করল। লোকেদের গরু-মোষ ঘোড়া প্রভৃতি সব জড় করে সে শহরের বাইরে চরাতে নিয়ে যায়। সারাদিন মাঠে মাঠে পশুদের চরায় আর বাঁশি বাজায়। সব সময়ই তার বগলে একটা বাঁশি দেখতে পাওয়া যায়। সোহনীর সঙ্গে আজকাল তার মাঠেই দেখা হয়। তুলার মাটির বাসন কেনার ক্ষমতা ইজ্জতবেগের আর নেই। বুখারের আমীরের ছেলে ইজ্জতবেগ পাঞ্জাবের সোহনীর জন্য রাখাল হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

শিল্পী সোহনী এতকাল অন্তঃপুরের অন্দরমহলেই থেকেছে। আজকাল সে জঙ্গলে, মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। মহীওয়ালের প্রেমে পড়ে আজকাল আর তার ঘরের কাজে মন বসে না। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে ফন্দি করে সে সকাল সন্ধ্যা শহর থেকে বেরিয়ে পড়ে। তাঁর বন্ধুরা নাচ গান করে মহীওয়ালকে খুশি রাখার চেষ্টা করে।

□

প্রেম আর কস্তুরীকে কে লুকিয়ে রাখতে পেরেছে? কিছুদিনের মধ্যেই সোহনী আর মহীওয়ালের প্রেমের কথা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। বদনামের হাত থেকে বাঁচার জন্য তুলা হাতের কাছে যে পাত্র পেল তার সঙ্গেই সোহনীর বিয়ে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। সোহনী অনেক মিনতি করেছিল—'বাবা, মহীওয়ালের সঙ্গে আমার জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ।' কিন্তু সারাদিন মাটির বাসন নিয়ে যার কাজ কারবার সেই তুলা কুমোর সোহনীর এই কাকুতি-মিনতির কোন মূল্যই দিল না। চোখের জল ফেলতে ফেলতে সোহনী একদিন পাল্কী চেপে শ্বশুর বাড়ী সংসার করতে রওনা হল।

□

ঝণা (চন্দ্রভগা) নদীর যে পাড়ে সোহনীর শ্বশুর বাড়ী, ঠিক তার বিপরীত পাড়ে তার বাপের বাড়ী; সেখানে তার বিরহে মহীওয়াল যন্ত্রনায় কাতর হয়ে ছটফট করে। একলা পাগলের মত সে 'সোহনী সোহনী' বলে ডাকতে ডাকতে পথে পথে

ঘুরে বেড়ায় আর চোখের জল ফেলে। খাওয়া দাওয়ায় অরুচি ধরে গেছে তাঁর। চিরকাল যে প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে, না খেয়ে খেয়ে সে আজ পালকের ক্ষীণ তনু। চমৎকার পাঞ্জাবী বলতে পারে সে এখন। আর সেই ভাষাতেই মর্মস্পর্শী শব্দে গান গেয়ে বেড়ায়। সে গানের প্রতি চরণেই সোহনীর নাম। মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে 'সোহনী' 'সোহনী' গুঞ্জন মুখরিত হয়ে ওঠে।

ওদিকে সোহনীরও প্রায় সেই একই অবস্থা। মহীওয়ালের স্মৃতিকে বুকে স্থান দিয়ে সে বিবাহিত স্বামীকে পর্যন্ত অস্বীকার করে চলে। দিনরাত শুধু মহীওয়ালেরই চিন্তা, মহীওয়াল ছাড়া আর কিছুতেই তার মন থাকে না।

একদিন ব্যাকুল হয়ে পথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মহীওয়ালের মনে হয়, সোহনী যেন তাকে ডাকছে। সে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে। কিন্তু শব্দটা যেন তার নিজের ভেতর থেকেই আসছে বলে মনে হতে থাকে। মহীওয়ালের প্রচণ্ড হাসি পেয়ে যায়। কেউ যেন ছলনা করছে। মহীওয়াল পাগলের মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। কিন্তু আওয়াজটা তো ঠিক শোনা যাচ্ছে! কেউ তাকে ডাকছে—'মহীওয়াল, মহীওয়াল' বলে। সে ছুটে একটা টিলার ওপর উঠে চারপাশ লক্ষ্য করে দেখে, কেউ কোথাও নেই। কিন্তু না, আওয়াজটা ঠিক আসছে। হয়তো সামনের গাছের ঝোপের আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে। 'মহীওয়াল! মহীওয়াল!' একটা ডাক সত্যিই ভেসে আসছে। তার নিজের শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে নির্গত প্রতিনিয়ত যে ধ্বনি 'সোহনী' হয়ে ফুটে উঠছে তার সঙ্গে ঐ ডাক মিলে চারধারে অনবরত কেবল ধ্বনিত হতে থাকে, 'সোহনী-মহীওয়াল', 'সোহনী-মহীওয়াল'; 'মহীওয়াল-সোহনী', 'মহীওয়াল-সোহনী'! সে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। তার মনে হয়, কেউ তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই, অথচ কেউ তার নাম ধরে ডেকে লুকিয়ে পড়ছে কোথাও। কখনো মনে হচ্ছে, শব্দটা বাইরে থেকে আসছে আবার কখনো মনে হয় শব্দটা তার নিজের ভেতর থেকেই আসছে। বার বার কেবল শোনা যেতে থাকে—'সোহনী-মহীওয়াল', 'মহীওয়াল-সোহনী'! হঠাৎ তার মনে হল শব্দটা দূরের ঐ খাদের মধ্যে থেকে আসছে। ছুটতে ছুটতে মহীওয়াল খাদের মধ্যে গিয়ে নামে। সেখানে নামার পর সে অনুভব করে, শব্দটা সেখানে নয় বাইরে থেকেই আসছিল। সে আবার ছুটে টিলার ওপর উঠতে থাকে, বুকের মধ্যে দম আটকে আসে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর, ক্লান্ত নগ্ন পায়ে আবার টিলার ওপর উঠে আসার পর তার মনে হল নীচের খাদের মধ্যে থেকেই যেন কেউ এখন ডাকছে—'সোহনী-মহীওয়াল! মহীওয়াল-সোহনী!' সত্যিই তো, এবার ঠিক খাদের মধ্যে থেকেই শব্দ আসছে। মহীওয়াল একছুটে খাদের ভেতরে গিয়ে নামে। নীচের দিকে নামতে নামতে তার মনে হতে থাকে, যতই সে নামছে শব্দটা যেন ক্রমশঃ পেছনে দূরে সরে যাচ্ছে। খাদের মধ্যে নামার পর তার আবার ভ্রম হতে থাকে—আওয়াজটা তো বাইরেই হচ্ছে। কেউ যেন অনেক ওপর থেকে ডাকছে—'সোহনী-মহীওয়াল! মহীওয়াল-সোহনী।' পরিশ্রমে অবসন্ন, তবু সে পাগলের

মত আবার ছুটে ওপরে চড়তে থাকে। ওপরে এসে চারিদিকে সে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে—কোথায় সে শব্দ? দূরে—যেন বহু দূরে তবু যেন কাছে—একবারে পাশেই মনে হয়। রাগে ক্ষেপে গিয়ে সে নিজের জামা-কাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। ঘর্মাক্ত কলেবরে, ধূলো কাদা মাখা শরীরে সে উন্মাদের মত যে দিকে দুচোখ যায় সেদিকেই ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে সে ঝর্ণার তীরে এসে পৌঁছায়—হয়তো শব্দটা জলের স্রোতের থেকেই আসছে। তার মনে হল, সত্যিই যেন শব্দটা ঝর্ণার জল থেকেই আসছে। মহীওয়াল নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আছড়ে পড়তে থাকা ক্রুদ্ধ স্রোতের সঙ্গে মহীওয়াল যুঝতে শুরু করে। ক্রমশ পেছনের তীর দূরে সরে যেতে থাকে, কিন্তু সামনের তীর যে কোথায় কতদূরে তা চোখে দেখা যায় না। মহীওয়াল অক্লান্তভাবে হাত-পা চালিয়ে ঝর্ণার উদ্ধত স্রোত কেটে এগিয়ে যেতে থাকে। তার কানে এবার সোহনীর ডাক এসে পৌঁছয়। একটা কান্নার স্বর যেন ভেঙ্গে পড়ছে—'মহীওয়াল! মহীওয়াল!' মহীওয়াল প্রচণ্ড বেগে হাত-পা চালাতে শুরু করে। ঠিকই তো, ঝর্ণার তীরে দাঁড়িয়ে সোহনীই বিলাপ করছে বটে। ইতিমধ্যে এক মাঝি মহীওয়ালকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি নৌকা তার কাছে এনে তাকে নৌকায় তুলে নেয়। সত্যিই সামনে সোহনী দাঁড়িয়ে। তার চোখে জলের ধারা। মহীওয়াল যেন তার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না। না, স্বপ্ন নয়, বাস্তবিকই সোহনী দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর সামনে। তারা দুজনে দুজনের দিকে দুবাহু প্রসারিত করে এগিয়ে আসে। অস্তগামী সন্ধ্যার ছায়া এক প্রশান্ত অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়।



শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় গরু মোষ ঘরে পৌঁছে দেবার পর মহীওয়াল সোহনীর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। ঝর্ণার তীরে এই পশুচারণের মাঠে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে।

মহীওয়াল একটা ভিস্তি কিনে নেয়। রাত হলেই সে ভিস্তিটা জলে ভাসিয়ে সাঁতার কেটে সোহনীর গ্রামের ঘাটে চলে আসত। প্রিয়তমার জন্যে সেখানে বসে অপেক্ষা করত। কখনো ছিপ ফেলে মাছ ধরতো অথবা আপন মনে বাঁশিতে সুর তুলত।

'সোহনী! তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমি বাঁশি বাজাই—আর বাঁশির সুর শুনে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ এসে জালে ধরা দেয়'—মহীওয়াল বলে।

'ওরে দুষ্টু! তুমি কেবল রোজ একটা করে মাছ ধরবে',—হাসতে হাসতে সোহনী জবাব দেয়।

তারপর থেকে প্রত্যেকদিন রাতে মহীওয়াল একটা মাত্র মাছ ধরে সোহনীর আসার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে থাকে। সোহনী এলে সেই মাছটা সেঁকে দুজনে খায়।

মহীওয়ালের কাছে বসে এভাবে মাছ খেতে সোহনীর দারুণ ভাল লাগে। খেতে খেতে তারা গল্প করে। নানান কথায় একসময় রাত কেটে ভোর হয়ে আসে। সোহনী তখন চুপি চুপি ঘরে ফিরে তার নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে।

একদিন ঝর্ণাতে এল প্রবল বন্যা। বর্ষাকাল সেটা। নদীর ওপরের দিকে পাহাড়ী অঞ্চলে হয়তো কোথাও বৃষ্টি হয়ে থাকবে। দুকূল ছাপিয়ে পাহাড় ভেঙ্গে ঝর্ণা মাঠের ফসল, কুয়ো সব ভাসিয়ে দিয়েছে। মহীওয়াল কোন মতে সোহনীর গ্রামের ঘাটে এসে পৌঁছয়, কিন্তু এই ভীষণ বন্যায় মাছ ধরে কি করে? মহীওয়াল অনেক চেষ্টা করেও সেদিন মাছের কোন সন্ধান করতে পারে না। নদীর জল মাটি গলা, একেবারে ঘোলা - স্রোতের সঙ্গে গাছপালা, কাঁটার ঝোপঝাড় আর খরকুটো বয়ে এসেছে। একটাও মাছ নেই কোথাও। তাছাড়া প্রায় মাইল খানেক পাড় ভেঙ্গে ভেসে গেছে—ছিপই বা সে ফেলে কোথায়? ওদিকে সোহনীর আসবার সময় হয়ে আসছে। খালি হাতে প্রিয়তমার সাথে কি করে দেখা করবে ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়ে মহীওয়াল। হঠাৎ চকিতে একটা চিন্তা মাথায় আসতেই তার মুখে হাসি ফোটে।

কিন্তু সে যা ভাবল তার কিছুই ব্যবস্থা সে সেদিন করে উঠতে পারল না। তার ইচ্ছেটাকে কাজে লাগাবার মত জিনিষপত্র ছিল না। সোহনী ঠিক তার নিজের সময় মত এসে হাজির হল। সে ঠাট্টা করে মহীওয়ালকে বার বার শোনাতে থাকে, তোমার সঙ্গে খাবো বলে আমি আজকাল শ্বশুর বাড়ীতে রাতের খাবার খাওয়া বন্ধই করে দিয়েছি। মহীওয়ালের সঙ্গে বসে খাওয়া যার কপালে লেখা রয়েছে তার গলা দিয়ে অন্য জায়গার খাবার কি আর কখনো নামে? সে কথা শুনে মহীওয়াল খুবই লজ্জিত হয়ে পড়ে। মুখ ঢাকবার আর কোন জায়গা নেই তাঁর!

পরের দিনও সেই একই রকমের বন্যা এবং বৃষ্টি। মহীওয়াল আজও বহু চেষ্টা করে কোন মাছ ধরতে পারে না। কিন্তু আজ রাতে যখন সোহনী আসবে, গতকালের মত মহীওয়ালকে আর লজ্জায় পড়তে হবে না, কারণ আজ সে তার প্রিয়তমাকে আপ্যায়ন করার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখেছিল। চারিদিক হাসিতে উদ্ভাসিত করে ঠিক সময়ে সোহনী জল ভেঙ্গে এসে পৌঁছয়। প্রতিদিন নতুন ভঙ্গি, নতুন রূপ, নতুন উপলব্ধির আস্বাদন। প্রেমে পড়লে রমণী যেন একটা ঘুড়ির মত হয়ে যায়, ক্রমশ উঁচুতে উড়তে উড়তে একসময় আকাশ ছুঁতে চায়। কিছুক্ষণ বাদে সে মহীওয়ালের মাছের টুকরো গুলো শিকে বিঁধে সেঁকতে শুরু করে।

'আজ তোমার এটা কেমন মাছ, ভাল করে সেঁকা যাচ্ছে না।'

'হ্যাঁ।'

'সেঁকতে বেশি সময় লাগছে।'

'হ্যাঁ।'

হুকো টানতে টানতে মহীওয়াল নিজের চিন্তাতেই ডুবে থাকে। মাছ খেতে বসে

সোহনীর সন্দেহ দৃঢ় হল, একটা কিছু গণ্ডগোল আছে কোথাও। আজকের মাছের স্বাদ অন্য দিনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। হঠাৎ মহীওয়ালের দিকে লক্ষ্য পড়তেই সোহনী দারুণভাবে চমকে ওঠে—মহীওয়ালের লুঙ্গীর কোঁচাটা রক্তে লাল হয়ে আছে।

'এত রক্ত এখানে লাগল কি করে ?' সোহনী এগিয়ে এসে তার লুঙ্গীটা পরীক্ষা করতে যায়।

আর মহীওয়াল সোহনীর কোলে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ে।

প্রিয়তমাকে খাতির করার জন্য আজ মহীওয়াল তার উরুর মাংস কেটে উপহার দিয়েছিল। এ ছাড়া সে আর কিইবা করতে পারতো—আজও সে কোন মাছ ধরতে পারে নি, আর রোজ রোজ কি করে সে ক্ষুধার্ত সোহনীকে অভুক্ত ফেরৎ পাঠাবে ? সোহনী আজকাল রাতের খাবার মহীওয়ালের সঙ্গে ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে খেতে পারে না।

মহীওয়ালের এই অপার্থিব প্রেমের কোন তুলনা বা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সোহনী তার ঠোঁটে, গালে, চোখের পল্লবে, মাথায় অজস্র চুমো খেয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। সোহনীর তৃষিত ঠোঁট ২টি বারবার মহীওয়ালের ঠোঁটের সাথে মিলিত হতে থাকে, তারা যেন একে অন্যের অন্তর-সুধা চুমুকে-চুমুকে পান করে। সে রাত্রে সোহনী যেন একটি দীপশিখা হয়ে মহীওয়ালের সারা শরীরে উত্তাপের পরশ ছড়িয়ে দেয়। সে তার দেহের প্রতিটি অনু-পরমানুকে সোহাগে, আদরে ভরিয়ে দেয়। ভোর হয়ে আসে, তার ফিরে যাবার সময় বয়ে যেতে থাকে তবু আজ মহীওয়ালকে ছেড়ে যেতে তার মন চায় না। শেষে নিরুপায় হয়ে সেখান থেকে যাবার আগে সে মহীওয়ালের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয় যে পরের রাত থেকে সে আর সোহনীর কাছে আসার চেষ্টা করবে না, তার বদলে সোহনী নদী পার হয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। যতদিন না পায়ের ক্ষত সম্পূর্ণ সেরে উঠছে, ততদিন সে জলে নামতে পারবে না এবং আজ সে নৌকায় ফিরে যাবে। তারা এরপর থেকে ভূরি কমলির দরবেশের দরগায় দেখা করবে সন্ধ্যার পর।

কথা বলতে বলতে আর এই সব ব্যাপার ফয়সলা করতে করতে আজ সোহনীর বেশ দেরী হয়ে যায়। চুপি চুপি আজ বাড়ীর উঠোনে ফিরে আসতে তার মনে হল লক্ষ লক্ষ চোখ যেন চারদিক থেকে তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। তার শ্বাশুড়ী আর ননদ নিজেদের খাটিয়ায় ঘুমের ভাণ করে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল।

সকাল হতেই সোহনীর শ্বাশুড়ী আর ননদ যেন তার দিকে অগ্নিবর্ষণ করতে থাকে। সোহনীর মনে হল, তার কমনীয় দেহ যেন তাদের সেই দৃষ্টিতে ঝলসে যাবে। শত্রুতার আর ঈর্ষার জলন্ত দুটো চিতা যেন তারা দুজনে। সারাদিন লোকজনের ভীড় আর কাজের মধ্যেও সোহনীর মনে হতে থাকে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। তার চারপাশের আবহাওয়ার মধ্যে একটা অদৃশ্য সাঁড়াশী যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। বাড়ীর মধ্যে লোকেরা যেন লুকিয়ে চুরিয়ে তার

আড়ালে কানে কানে ফিসফাস করছে, শলাপরামর্শ করছে। কোনমতে দিন কাটে। একসময়ে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে লোকেরা শুতে যায়। আর সোহনী উঠোনে লোকেদের শুতে দেখেই মহীওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়ে। নদী পার হবার জন্যে সে রান্নাঘর থেকে একটা ঘড়া উঠিয়ে নেয়। সোহনী বাইরে যেতেই তার যে খল ননদ এতক্ষণ ঘুমের ভাণ করে চোখ বুঝে পড়েছিল সে সন্তর্পণে তার পিছু নেয়। আর তার শ্বাশুড়ী খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে বিষোদ্গার করতে থাকে। এদিকে, বাড়ী থেকে বেরিয়েই সোহনী দ্রুত পায়ে ঝর্ণার তীরে এসে উপস্থিত হল। আজ নদী একেবারেই শান্ত. গত দুদিনের সঙ্গে তার কোন মিলই নেই। মহীওয়ালের সঙ্গে দেখা করার উৎসুকতায় কোনদিকে না তাকিয়েই সোহনী দেখতে দেখতে তার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যায়। সোহনীর ননদ নদীর পারে বসে সারারাত তার মুণ্ডপাত করতে থাকে আর ফন্দি আঁটে কি করে তাকে জব্দ করবে। ভোর হয়ে আসার মুখে সে দেখে সোহনী ঘড়া নিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে ফিরে আসছে। তার ননদ একবার ভাবে চোরকে হাতে নাতে পাকড়াবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করতে পারে না। একটা সঘন বটগাছের আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে।

নদী থেকে উঠে আসে সোহনী। ভিজে জামা কাপড় নিংড়ে জল ঝরায়। কি অনবদ্য সুন্দর সুগঠিত দেহ! চাঁদের আলোয় তার দেহ-সুষমা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তার ননদ অবাক চোখে দেখতে থাকে, সোহনী ঘড়াটা একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে বাড়ীর দিকে রওনা হয়। ভোরের আলো ফোটার আগেই সে নিজের খাটিয়ায় এসে শুয়ে পড়ে। তখন গরমের সময়। পথেই তার গায়ের কাপড় শুকিয়ে গিয়েছিল।

সোহনীর ননদ ফিরে এসে তার মাকে সব কথা জানায়। আসলে ননদ ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। বয়সে সে সোহিনীর থেকে যথেষ্ট বড়, কিন্তু তার কপালে এখনো বর জোটেনি অথচ সোহনী কিনা বিয়ের পর এক স্বামীকে ছেড়ে অন্য এক প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমলীলায় মেতে উঠেছে?

শেষে মা-মেয়েতে ভেবে চিন্তে ঠিক করল, যে মেয়ে তাদের ছেলের মনে এমনিভাবে দাগা দিচ্ছে তাকে একেবারে প্রাণে শেষ করে দেওয়াই বাঞ্চনীয়। তার ননদ কুমোর বাড়ী থেকে একটা কাঁচা মাটির ঘড়া এনে নদীর পারে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখা সোহনীর ঘড়ার সঙ্গে বদলে রাখে।

রাত্রিবেলা সোহনী যথাসময়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে আসে। মহীওয়ালের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে, তাই সে দ্রুত পায়ে ঝর্ণার তীরে এসে ঝোপ থেকে ঘড়া নিয়ে জলে নামে। পূর্ণিমার রাত। নদীর জল কিন্তু বেশ অশান্ত। মহীওয়ালের সাথে মিলনের ব্যগ্রতায় সোহনী যেন ঢেউয়ের ওপর দিয়ে পিছলে এগিয়ে যেতে থাকে। সামান্য পথ যাবার পর তার মনে হল হাতের ঘড়ার মধ্যে কুলকুল করে যেন জল ঢুকছে। কাঁচা মাটির ঘড়া অল্পক্ষণের মধ্যেই একেবারে কাদার তাল হয়ে জলে ধুয়ে যায়। সোহনী তখন কেবল মাঝ-নদীতে পৌঁছেছে।

সামনের নদীর পারে ভুরি-সাঁইবাবার দরগা—মহীওয়াল সেখানে সোহনীর পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে। সোহনী মহীওয়ালের নাম ধরে চীৎকার করে ডাকতে থাকে। নদীর জলে সে সময়ে জোয়ারের টান ধরেছে; সুযোগ বুঝে ঝড়ের দাপটও সুরু হয়ে যায়। ঢেউয়ের ধাক্কায় সোহনী ক্রমশঃ বেহুশ হয়ে পড়তে থাকে। ঢেউয়ের হাতে এলোমেলো হ'য়ে যায়। বারবার মহীওয়ালের নাম ধরে ডাকে। পেছনের পারে দাঁড়িয়ে তার ননদ খিল খিল হাসিতে ফেটে পড়ে। সেই ঝড় আর তুফানের ভয়ঙ্কর রাতে তার হাসি ডাইনীর উল্লাসের মত ভেসে বেড়ায়। এদিকে, মহীওয়াল শেষ পর্যন্ত সোহনীর ডাক শুনতে পায়। ছড়িতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে পীরের দরগার বাইরে বে'রিয়ে আসে। আহা, কি অনিন্দ্য সুন্দর সাহসী যুবক ছিল সে। সোহনীর ডাক আর একবার শোনামাত্র বিন্দুমাত্র ভাবনা চিন্তা না করে সেই অবস্থাতেই আহত পা নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মহীওয়াল জলে লাফ দেওয়ার সাথে সাথেই প্রচণ্ডবেগে বন্যার স্রোত ধেয়ে আসে। স্রোতের টানে সোহনী আর মহীওয়াল একে অন্যের কাছে এসে যায়, তারা বাহুবন্ধনে ধরা পড়ে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ননদ তাদের দুজনকে একসাথে দেখতে পায় তারপরেই নদীর উত্তাল ঢেউ তাদের গ্রাস করে নেয়—সোহনী আর মহীওয়াল দুজনের কাউকেই আর দেখতে পাওয়া যায় না। তারা দুজনে পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে ঝর্ণার জলের গভীরে হারিয়ে যায়। ওধারে নদীর পারে দাঁড়িয়ে সোহনীর ননদ তখন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে।

শিবকুমার

পুরন ভগত

পাঞ্জাবের শহর শিয়ালকোটের ঘটনা। কোন এক সময় সেখানে ছিল রাজা সলবানের রাজত্ব। রাণী ইচ্ছারাঁর কোলে যখন পুত্র সন্তান জন্ম নিল, সলবান খুশীতে ভরপুর হ'য়ে উঠলেন, যেন তার সব আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়ে গেছে তাই রাজকুমারের নাম রাখলেন পুরন।

সেই সময়ে নাথ যোগীদের খুব প্রভাব ছিল। এরা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী ছিল। এবং সবসময় স্ত্রীজাতির সংস্পর্শে থেকে মানুষকে দূরে রাখার পক্ষপাতী ছিল। রাজা সলবান ছিলেন এই নাথ যোগীদের শিষ্য। তাই পুরনের জন্মের সময় যোগীরা সিদ্ধান্ত নিল, 'প্রথম বারো বছর পুরনকে পরিবারের পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে হবে। তাকে গ'ড়ে তুলতে হবে প্রচণ্ড সংযমের মধ্য দিয়ে, যাতে জীবনের শুরু থেকেই তার শুভ্র নির্মল চরিত্র গ'ড়ে উঠতে পারে। এ ব্যাপারে সম্মতি দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ, কিন্তু রাজা নিজের সন্তানের মঙ্গলের জন্যই এই সিদ্ধান্তে একমত হলেন। এবং—

পুরন এক হনেরিয়োঁ বাহর আয়া,
দুজী কোঠরী দে বিচ্চ পা দিত্তা।
কাদর য়ার মীয়াঁ পুরণ ভগত নাহীঁ,
বাপ জনম দিয়াঁ কৈদ করা দিত্তা।[1]

নাথ যোগীদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কাজটা ঠিকই হ'ল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যোগীদের সাধনা মানবজীবনের প্রাকৃতিক নিয়মগুলোকে মেনে চলেনি। মা এবং ছেলে যদি একে অন্যের কাছ থেকে দূরে থাকে তবে তারা পরস্পরের কাছে শুধুমাত্র স্ত্রী-পুরুষ ছাড়া আর কি হ'তে পারে? কোন কিছু থেকে মনকে জোর করে আলাদা করে রাখলে মানুষের মন তার প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হয়। রাজা সলবান ছেলেকে তার মা'র কাছ থেকে আলাদা তো করলেনই, তার ওপরে নিজে আরও

---

1. এক অন্ধকার থেকে পুরন বেরিয়ে আসতে না আসতেই তাকে আর এক অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হ'ল। তাকে জন্মাতে না জন্মাতেই তার পিতা বন্দী করে ফেলল।

একটা বিয়ে করে বসলেন। রাজার যথেষ্ট বয়স হ'য়েছিল। আর নববিবাহিতা রাণী লুণা ছিল পূর্ণ যুবতী। তাই, স্বভাবতই, রাজাকে নতুন বধূর হাতের মুঠোয় ধরা দিতে হ'ল—

জীম জায়ে রাজে সলবান আন্দী,
ইক স্ত্রী হোর বিআহ্ কে জী॥
আহেদী জাত চমিয়ারী তে নাঁ লুণাঁ,
ঘর আইঁ সী ইন মনা কে জী॥[1]

পুরন আলো-আঁধারে বড় হ'তে থাকে আর অন্যদিকে সলবান নববধূকে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। পিতা-পুত্রের মধ্যে না গ'ড়ে উঠল স্নেহ-ভালোবাসা, না গ'ড়ে উঠল সম্মানবোধ। বারো বছর কেটে গেল। পুরন প্রথম এসে দরবারে রাজাকে কুর্ণিশ করল। দীর্ঘ সময়ের পরে পিতা-পুত্রের দেখা হ'ল। দু'জনে দু'জনকে নিজ নিজ পরিচয় ব্যক্ত করলেন। স্ত্রী সুখে বিভোর রাজা বললেন, 'আমার ছেলের বিয়ে আজই দিতে হবে।'

সত্য ও ধর্মে অটল বিশ্বাসী পুরন জবাব দেয়—'দয়া করে, বিয়ের শেকল পরিয়ে আমাকে পরমাত্মার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবেন না।' ভগবানের ভক্তের সঙ্গে সাংসারিক মানুষের মিলন দুরূহ। তাই জীবনের দু'টি ভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধল।

রাজদরবারে রাজা পিতা এবং ভক্ত সন্তান পরস্পরের সামনে মতভেদ প্রকট করে। রাজা সলবান তাঁর আদেশ অমান্য দেখতে অভ্যস্ত নন। একসময় মন্ত্রীমশাই ভয় পেয়ে যান, রাজা না জানি নিজের সন্তানের বিরুদ্ধেই কোন হুকুম দিয়ে বসেন। তিনি রাজকুমারের সরলতার কথা বলে রাজাকে শান্ত করলেন। রাজা তখন কয়েকজন দাসকে সঙ্গে দিয়ে পুরনকে আদেশ দিলেন, অন্দরমহলে মায়েদের প্রণাম করে আসার জন্য।

পুরন এবং লুণা দু'জনেই আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। একজনের কাছে জীবনের মানে ভোগ-বিলাস, অন্যের কাছে জীবনের অর্থ যোগ। তাদের কেউই অপরের জীবনবোধের সত্যতা বুঝতে অপারগ। বস্তুত রাজগৃহের রীতিনীতি পুরন এবং লুণা দু'জনকেই দু'টি আলাদা জীবনবৃত্তে বেঁধে রেখেছিল। তাই দু'জনেই দু'জনের বিচ্ছিন্ন জীবনের কারণে পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত ব্যবহার করছিল। পুরণ ব'লল—

জিস দী স্ত্রী তু ওহ্ হ্যায় বাপ মেরা,
তেরে শিকম হী জমিয়াঁ জান মায়ে।

লুণা পুরনের কাছ থেকে এই জবাব পেয়ে ক্রোধান্বিত হ'য়ে উঠল। পুরনকে তার মনে হ'ল বিষ। তার প্রতি লুণার মমতার লেশ মাত্র অবশিষ্ট রইল না। লুণা

---

1. রাজা সলবান চামার জাতের এক মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন, নাম লুণা। এই নতুন স্ত্রী নিজের হুকুম চালাবার শর্ত স্বীকার করিয়ে নিয়ে তবে রাজার ঘরে প্রবেশ করেছে।

চাইছিল পুরনকে নিজের করে নিতে। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তখন পুরনের জীবনই শেষ করার কথা সে ভেবে ব'সল। তাই সে একইসঙ্গে তার প্রেম এবং ঘৃণা দুই-ই প্রকাশ করল।

লুণা স্পষ্ট জানিয়ে দিল, যদি পুরন বেঁচে থাকতে চায় তবে লুণার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করুক, নইলে তাকে নিজের প্রাণ বাজী হিসেবে ধরতে হবে। কিন্তু পুরনের কাছে দেহ থেকে ধর্মই ছিল বেশী প্রিয়। ধর্মের পথেই তার চলা। সেই পথেই সে বাঁচতে চায়। পথভ্রষ্ট হ'তে তার সাধ নেই।

সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মৃত্যুর সঙ্গে ধর্মকে একাত্ম করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মের পথে যদি মৃত্যু না এসে দাঁড়ায়, তবে বুঝতে হবে ধর্ম দম্ভের কাজ করছে। পুরন যে রাজপুরে দাঁড়িয়ে 'না' বলে এল, পরে সেখান থেকেই জারী হ'ল তার মৃত্যুর পরোয়ানা। পুরন যখন লুণাকে একই জায়গায় ফেলে রেখে বৈভবের রাজপুরী ত্যাগ করল, লুণা সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত সাজ-অলঙ্কার ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। গায়ে জড়িয়ে নিল কিছু ময়লা বেশ। রাত হ'লে, বিলাসী রাজা অন্দরমহলে এসে চারপাশের অবস্থা দেখে চমকে গেলেন। সাঁঝবাতি যেমন তেমনই পড়ে আছে, আর লুণা অন্ধকারে অন্তঃপুরে শুয়ে আছে। চারপাশে ছড়িয়ে আছে অলঙ্কার, বেশবাস। রাজা কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না। রাণী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রাণী যা বলল, তা শুনে রাজা ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। রাজদরবারেও ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে রাজা খুশী হননি। এখন শুধু অন্দরমহলেই নয়, অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল রাজার মনেও। তিনি শীঘ্র ডেকে পাঠালেন জল্লাদকে। রাজমহলের অন্ধকারে বসে বসেই নিজের ছেলের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন।

প্রাতঃকালে সূর্যোদয় ঘটল। সূর্যকে অর্ঘ দিতে গিয়ে রাজ-পুরহিতেরও হাত কেঁপে উঠল। রাজ্যে দোকানপাট বন্ধ হ'য়ে গেল। পুরবাসীরা তাদের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিল। পুরন সেই শূন্য বাজারের শূন্য পথ বেয়ে তখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। দলের সামনে চলেছে নির্ভীক পুরন। নিস্তব্ধ, পিছনে ভয়ঙ্কর জল্লাদ। তার পিছনে খালি পায়ে, ঘোমটা খোলা অবস্থায় মা ইচ্ছারাঁ। গোটা শহরে একটি প্রতিবাদও নেই।

রাজার আদেশ ছিল, পুরনকে তিলে তিলে মারতে হবে। তার হাত কেটে দেওয়া হবে এবং তাকে কূয়োর মধ্যে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এতে যে তাকে দেখবে সেও বুঝে যাবে অপরাধের শাস্তি কি, পুরনও বুঝতে পারবে, মৃত্যু কাকে বলে। রাজা শুধু শাস্তিই দিতেন না, তিনি সেই শাস্তি উপভোগও করতেন। কিন্তু পুরনকে যতই কষ্ট দেখা হতে লাগল, দেখা গেল, ততই প্রসন্ন তার মুখ। জল্লাদেরা শেষটায় রাজাকে জানাল, আপনার আদেশ পরিপূর্ণ ভাবে পালন করা হয়েছে। সারা শহরে উঠল হাহাকার। পুরনের এ সবই ভাগ্য। প্রথমে সে পেয়েছে মা'র গর্ভের অন্ধকার, তারপর পিতার দেয়া অন্ধকার—নির্বাসন। এবং এখন সৎ মা'র দয়ায়

পাওয়া এই কূয়ো। তৃতীয় অন্ধকারে পূরনের অন্তর্জ্যোতি যেন আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

কিছুদিন পরে ওই কূয়োরই পিছনে নাথ যোগীদের ডেরা তৈরী হ'ল। অনেক বছর পরে ওই দুর্গন্ধময় কূয়োতে যখন তারা বালতি নামালো, মনে হ'লো, কূয়োর ভিতর থেকে কোন মানুষের শব্দ ভেসে এল। প্রথম তো যোগীরা ভয়ে শঙ্কিত হ'য়ে পড়ল। তাদের মনে হ'ল, এ কোন কূয়ো নয়, কোন ভূতের আড্ডা। পরে যোগীদের গুরু গোরখনাথ ভালো করে কূয়োর ভিতরটা দেখলেন। ভিতরে কোন ভূত-প্রেত তো নেই—একটি লোক ঝুলে রয়েছে। গুরুর আদেশে অন্যেরা ঝুলে থাকা লোকটাকে উঠিয়ে তুলল। বলা হয়ে থাকে, তার হাত যেখানে থাকার সেখানেই ছিল। নাকি গুরুর কৃপায় পূরন হাত ফেরত পেয়েছিল? নাকি জল্লাদরা রাজার আদেশ ঠিক ঠিক পালন করেনি? কিন্তু পূরনের কাছে শুধু হাতই নয় তার সারা দেহই বিকলাঙ্গ হ'য়ে গিয়েছিল। কেন না, তার শরীরের কোন অঙ্গই তো কোনদিন কোন কাজে লাগেনি। কূয়ো থেকে বেরিয়ে পূরন গুরু গোরখনাথের পায়ে পড়ে দীক্ষা ভিক্ষা করল।

গুরু তাকে দীক্ষা দিলেন। কিন্তু তখনও একটা পরীক্ষা বাকী ছিল। পূরন কামিনী নারীর মোহপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু কোন প্রেমিকা নারীর প্রেম-জাল থেকে তখনও সে বেরিয়ে আসেনি।

পরের দিন পাশের শহরে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য রওনা হ'ল। একদিকে তার পিতার শহর—সেই শহরে যাবার সব পথই পূরনের জন্য বন্ধ। অন্যদিকে এটা ছিল রানী সুন্দরাঁর রাজধানী, এই রাজ্যের সব কাজ হ'ত নারীদের মাধ্যমে।

রাণী সুন্দরাঁ খুব সুন্দর ছিলেন। আর ছিলেন পূর্ণ যৌবনা। তবে নিজের সৌন্দর্য ও যৌবনের চেয়ে তার গর্ব ছিল তার নিজের সততার প্রশ্নে। পূরন রাজদ্বারে গিয়ে ভিক্ষার জন্য দাঁড়াল। রাণীর পরিচায়িকারা ভিক্ষা দিতে এসে পূরনের রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। রাণী উপর থেকে নিচে দণ্ডায়মান যোগীকে দেখল। চোখ তার জুড়িয়ে যায়। হীরা-পান্নার থালা নিয়ে রাণী স্বয়ং নেমে এলো রাজদ্বারে। যোগী কিন্তু রাণী কিংবা হীরা-পান্নার থালা কোনদিকেই চোখ তুলে তাকাল না। রাণী যা কিছু তার ঝুলিতে ঢেলে দিল সে তাই নিয়ে ফিরে এলো।

পূরন প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল। গুরু তাকে দ্বিতীয়বার ওই একই পরীক্ষায় পাঠালেন। যখন পূরণ একই দিনে দ্বিতীয়বার এলো, সুন্দরাঁর মনে হ'ল, তার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য এবার স্থির লক্ষ্য ভেদ করবে। সে এখন চাইছিল, পূরনের ওপর পূর্ণ বিজয়। পূরণ ভোজনের জন্য ভিক্ষা চেয়ে ব'সল। রাণী তখন ভালো ভালো খাবার তৈরী করে দাসীদের সঙ্গে নিয়ে ব'লল, 'চলো, আমিও তোমার গুরুকে প্রণাম করে আসি।' আসবার সময় সারাপথ সুন্দরাঁর দৃষ্টি পড়ে থাকে পূরনের যৌবন-সৌন্দর্যের প্রতি।

আশ্রমে এসে সুন্দরাঁ সমস্ত যোগীদের ভোজন করাল। সুন্দরাঁর সেবায় প্রসন্ন

হ'য়ে গুরু গোরখনাথ বললেন, 'রাণী, তোমার প্রতি আমরা প্রসন্ন। যদি কিছু প্রার্থনা করতে চাও তো করো।' রাণীর মনের মধ্যে ঝড় ব'য়ে গেল। সেই ঝড়কে রোধ করতে করতে সে বলে, 'গুরুজী, ভগবান আমাকে সব দিয়েছেন। এখন আর কোন কিছুর অভাব নেই।' কিন্তু তবুও সর্বজ্ঞ গুরু ব'ললেন, 'অনেককিছু পাবার পরও কোন না কোন ইচ্ছা অপূরণ থেকে যায়। কিছু প্রার্থনা করো।' এই সময় নিজের মনের লোভ সামলানো রাণীর পক্ষে কঠিন হ'য়ে পড়ে, তবু দাসীদের সামনে নিজের সংযমের মিথ্যা প্রকাশ ঘটিয়ে বলে, 'আপনি সবকিছুই জানেন। আপনি যা দেবেন।' কিছুক্ষণ পরে দাসীরা এদিক ওদিক চলে যায়। তখন গুরু গোরখনাথ বললেন, 'সময় কেটে গেলে আর কিছু পাবে না। তৃতীয়বার বলছি, কিছু প্রার্থনা করতে হয় তো এখনো করো।' সুন্দরীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। সে মুখে কিছু বলতে পারে না। চোখের ভাষাতেই সে তার প্রার্থনা জানায়—

রাণী সুন্দরা উট কে নজর কী তী,
পুরন ভগত হ্যায় অমৃত দল মেরা।

গুরু গোরখনাথ পূরনকে আদেশ দিলেন এবং সুন্দরীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। পূরন বুঝতে পারছিল, গুরু তাকে দ্বিতীয়বার আগুনে নিক্ষেপ করেছেন। আর এটাই তাকে যাচাই করে নেবার সময়। রাজবাড়িতে পৌঁছেই রাণী পূরনকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। পূরনের মনে হতে থাকে তাকে যেন কাঁটার শয্যায় বসিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। পূরন সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এবার রাণী তাকে একটা ফরাসে বসিয়ে দেয়। কিন্তু সে সোনায় মোড়া ফরাসে বসে ধ্যানস্থ হয়। সারারাত একটা উজ্জ্বল জ্যোতির মতো সে জ্বলজ্বল করতে থাকে। রাণী তার সেই উজ্জ্বল দেহের দিকে তাকিয়ে থাকে। সকাল বেলায় পূরন শৌচাদির জন্য মহল থেকে বেরিয়ে আসে। শৌচাদি শেষে মহলে না ফিরে পূরনের আশ্রমের দিকে পা বাড়ায়। দাসীরা তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে তাকে মহলে ফেরার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। পূরন বলে, 'যে জিনিস যোগীরা একবার ত্যাগ করে তা তারা পুনঃগ্রহণ করতে পারে না।

দাসীরা যুক্তি দেয়, 'গুরুজী তো আপনাকে রাণী সুন্দরীর সঙ্গে পাঠিয়েছেন।'

পূরন উত্তর দেয়, 'গুরুর আদেশ অনুযায়ী আমি তো রাণীর সঙ্গে গিয়েছি।'

'কিন্তু আপনি সেখানে থাকছেন না কেন?'

'গুরুজী তো সঙ্গে যাবার কথা বলেছিলেন। থাকার কথা তো বলেন নি।'

দাসীরা ফিরে চলে আসে। রাণী হতাশ হ'য়ে পড়েন। সে দৌড়ে রঙমহলের ছাদে উঠে। পূরনের যাত্রাপথের দিকে তাকায়। কিন্তু পূরনের পিঠ ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পায় না। রাণী তার হারানো প্রেমের বেদনায় বিলাপ করতে শুরু করে এবং পূরনকে পাগলের মতো ডাকতে থাকে।

'রে রঙ্গমহল তে চড় রাণী,
রো রো আখদী পুরনা লুট্‌ট গিয়েঁা।
বাগ শোক দে পক্ক তৈয়ার হোয়,
নেহুঁ লাএ কে পুরনা পুট্‌ট গিয়েঁা।
ঘড়ী বৈঠ না কীতীয়াঁ রজ্জ গল্লাঁ,
ঝূঠী প্রীত লগাএ কে উট্‌ঠ গিয়েঁা।
কাদরয়াদ মিয়াঁ সস্‌সী বান্‌গ ম্যায়নুঁ
থলাঁ বিচ্চ কুরলাঅন্‌দী সুট্‌ট গিয়েঁা।

যখন পুরনকে আর দৃষ্টিতে ধরে রাখা গেল না, পুরন দিগন্তে হারিয়ে গেল—তখন রাণী রঙমহলের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল। সারা শহর হাহাকার করে উঠল।

পুরন নিজের গুরুর সামনে দাঁড়িয়ে। গোরখনাথ পুরনের সংযম দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেছেন। পুরন না কখনো মা-বাবাকে মনে করে, না কখনো নিজের জন্মভূমির কথা ভাবে। সে না কখনো লুণার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, না কখনো মনে করে সুন্দরাঁর প্রেমের কথা। সে তো বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞানে দাঁড়িয়ে। স্তুতি-নিন্দা বা প্রেম বা ঘৃণা সবকিছু থেকেই সে দূরে। গুরু গোরখনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, পুরন এখন অন্যদের দীক্ষা দেবার উপযুক্ত। গুরুজী পুরনকে যোগ শিক্ষা দেবার কথা বললেন, তবে তা তিনি শুরু করতে ব'ললেন নিজের শহর থেকেই। গুরু ব'লেন, 'এই শিক্ষাদান তোমার বাবা এবং তোমার সৎ মা'র জন্য প্রয়োজন।'

আদেশ শিরোধার্য করে পুরন নিজের শহরের পথে পা বাড়াল। এই শহর থেকে বেরিয়ে আশা এবং সেখানে ফিরে যাওয়ার মধ্যে বারো বছর কেটে গেছে। সেই সময় রাজা সলবানের প্রভাব অনেক কমে এসেছে। লুণার কাছে তার নিজের তার নিজের শরীরকে অভিশপ্ত মনে হ'ত। ইচ্ছারাঁ কেঁদে কেঁদে অন্ধ। শহরে রাজার আদেশ নির্দেশ প্রসঙ্গে কেউ কোন কথাই বলে না। মনে হয়, কোন প্রজাই রাজার শাসন মানে না। প্রত্যেক নগরবাসীর ওপরে যেন এক প্রকাণ্ড ছায়া ছেয়ে আছে। পুরনের জন্মের সময় থেকেই রাজা স্মরণগৃহ বানিয়েছিলেন। কিন্তু পুরনের চলে যাবার পর রাজার মন এতই খারাপ হ'য়েছিল, সেই গৃহ রক্ষার কথা তিনি ভাবেনই নি। পুরন এমনি এক ধ্বংসাবশেষের শহরে এল।

হরভজন সিং

রাজা রসালু

রাজা সলবান তার একমাত্র ছেলে পূরনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। দোষীকে তার উপযুক্ত সাজা দিয়ে তিনি নিজে ন্যায় আচরণ করলেন বটে কিন্তু তার মনে কোন সুখ ছিল না। তাঁর দুই রাণী কিন্তু দুজনেই নিঃসন্তান। এতবড় রাজ্য, প্রাসাদ, ঘরবাড়ী কিন্তু কোন জাঁকজমক আনন্দ আহ্লাদ নেই। রাজার ক্রমশঃ বয়স বাড়তে লাগল অথচ রাজ্যের উত্তরাধিকারীর এখনও জন্ম হল না। পূরনের মা, বড়রাণী ইছারাঁ তো পুত্রশোকে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছেন, আর ছোট রানী লূণার যৌবন বিদায় নিতে চলেছে, তার কোলে আজও কোন সন্তান এল না। তার অন্তরে এক গভীর ক্ষত ছিল, তা থেকে নিয়তই রক্তক্ষরণ হত। নিজের অসাবধানতায়, স্বপ্নে অথবা রাগের মাথায় সে নিজেই হয়তো তার কৃতপাপ একদিন প্রকাশ করে ফেলবে, এ নিয়ে তার সবসময় মনের মধ্যে একটা ভয় ছিল। আজ বহু বছর সে তার সাজসজ্জার দিকে কোন নজর দেয় না। রাণীর প্রতি রাজাও বিশেষ খেয়াল করেন না। রাজপ্রাসাদে সবকিছু থেকেও যেন নেই। দাসদাসীরাও ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়।

একদিন শোনা গেল, এক সাধু এসে পূরনের কূয়োর কাছে আস্তানা পেতেছে। বহু বছর কেউ সেই কূয়ো থেকে জল তোলেনি। চারপাশের গাছপালা বাগান সব শুকিয়ে গিয়েছিল। ব্যবহার না করার জন্য কূয়োর জলে পর্যন্ত শ্যাওলা পড়ে গিয়েছিল। সেই অশুভ বাগানে কেউ বেড়াতে পর্যন্ত যেত না। কিন্তু সাধুর আসার পর কূয়ো থেকে আবার জল তোলা হতে থাকে, চারধারের বাগান আবার শ্যামল সবুজ হয়ে ওঠে এবং ভক্তজনেরা আনাগোনা শুরু করে। সাধুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা রাজবাড়ীতেও গিয়ে পৌঁছয়। লোকেরা বলাবলি করে, প্রাসাদের ছাদের আলসেতে একটা সাদা কাক এসে বসেছে। ইচ্ছারাঁ আর লূণা দুজনেরই মনে হতে থাকে তাদের ছেলে যেন 'মা-মা' বলে ডাকছে। তারা খালি পায়ে হেঁটে যোগীকে দর্শন করতে যাবে বলে স্থির করেন।

রাণী ইচ্ছারাঁ প্রায় বারো বছর ধরে প্রাসাদে বন্দী জীবন কাটাচ্ছেন। আজ প্রথম তিনি সেই শোকপুরী থেকে বেরিয়ে এলেন গোলাপী বেনারসী জোড় পরে।

দেখতে দেখতে সারা সহরে সে খবর ছড়িয়ে পড়ল। কোচয়ান জুড়িগাড়ীতে ঘোড়া জুতে দেওড়িতে হাজির। কিন্তু পাগলিনী মা খালি পায়ে হোঁচট খেতে খেতে সন্তানের স্নেহের টানে যেন এগিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর অন্ধ দুচোখ যেন ছেলের বাগানের রাস্তা পরিষ্কার চেনে। রাণী হেঁটে সামনে চলেছেন আর পেছনে পেছনে রাজবাড়ীর ঘোড়ার গাড়ী। রাণী এসে পৌঁছনোর আগেই তার আসার খবর পূরনের কাছে পোঁছে যায়। তপস্বী তার মাকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেদিকে আসতে দেখে সে নিজেই ব্যস্ত হয়ে আসন ছেড়ে এগিয়ে যায়। মাঝ পথেই গিয়ে সে মা'র হাত ধরে। মা-ছেলেতে এমনভাবে হাত ধরে পথ চলার সময় ইচ্ছারাঁ বলেন :

'তোর স্পর্শ ঠিক আমার ছেলের মত লাগছে। তুই কি আমার তপস্বী ছেলে ?'

যোগীর মনও আর্দ্র হয়ে ওঠে। বহু বছর বাদে তার মা'কে স্পর্শ করার সৌভাগ্য হল। সে বলে :

'মা, আমিই তোমার তপস্বী ছেলে।'

সে কথা শুনে পূরনের বাগানের মতই তার মা প্রাণবন্ত ও সজীব হয়ে ওঠেন। তার চোখের হারানো জ্যোতি ফিরে আসে, শীর্ণ শুষ্ক বুকে দুধের ধারা বইতে থাকে।

ইচ্ছারাঁর পেছনে পেছনে রাজা সলবান এবং লূণাও আসছিলেন। তাঁদের দেখে উপস্থিত দর্শকদের মনে হতে থাকে যেন ঘূণ ধরা শুষ্ক বিশীর্ণ দুটি গাছ পথ হেঁটে আসছে। পূরন কি এদেরও তার স্পর্শে পল্লবিত সজীব করে তুলবে ? পূরন তার বৃদ্ধ বিষন্ন পিতাকে আসতে দেখে তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সলবান ধুনির কাছে এসে উপস্থিত হলে সে নত হয়ে প্রণাম করে। রাজা বিস্মিত হয়ে যান। তিনি বলেন :

'যোগীবর, আমার পাপের বোঝা আর বাড়িও না। তোমার এ ধুনি থেকে এককণা বিভূতি নেবার আশায় এসেছি। আমি তোমার কৃপাপ্রার্থী।'

'রাজা, এ ধুনি আপনারই দান করা, আপনার খুশিমত এর থেকে নিতে পারেন।'

রাজার বিস্ময় বেড়ে যায়। তার মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না। কিন্তু পুত্রহীনা লূণা আর স্থির থাকতে পারে না। সে বলে :

'যোগীরাজ, আপনার যদি রাজার প্রতি এতই দয়া তো অনুগ্রহ করে রাজাকে একটি পুত্র সন্তান বর দিন।'

সন্ন্যাসী উত্তর দেয় : 'রাজার তো এক ছেলে বর্তমান রয়েছে।'

রাজার চোখ থেকে জলের ধারা বইতে থাকে। তিনি বলেন : 'যোগীবর, এক ছেলে ছিল কিন্তু এখন আর নেই। থাকলে সেই পাপীকেও আজ আমি গ্রহণ করতে রাজী। সেই ছেলে মারা যাবার পরই তো...।' সন্ন্যাসী রাজার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে, 'না রাজা, আপনার ছেলে আজও জীবিত রয়েছে। সে পাপী নয় এবং তাকে আপনি এখন আর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেও পারবেন না।'

রাজা জানেন সন্ন্যাসীরা মিথ্যে কথা বলে না। তিনি রোষ নেত্রে লূণার দিকে তাকান। লূণা তো আগেই পাথর হয়ে গিয়েছিল। তার চোখে জল এসে যায়। একে তো যোগীর সেই তেজদীপ্ত চেহারার সামনে মিথ্যে বলা সম্ভব নয় আর অন্য দিকে রাজার চোখে ক্রোধের প্রকাশ। তাছাড়া, লূণা সন্ন্যাসীর কাছে নিজের সন্তান কামনায় এসেছে। সে কাঁদতে কাঁদতে নিজের দোষ স্বীকার করে: 'পূরনের কোন দোষ ছিল না। আমারই বুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল, আমিই তার রূপের মোহে নিজেকে সামলাতে না পেরে অধর্ম করেছিলাম।' রাজা কোষ থেকে তলোয়ার খুলে তখনই লূণার গর্দান নিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু পূরন রাজার হাত ধরে ফেলে তাকে বাধা দিয়ে বলে: 'রাজা, যা কিছু ঘটেছে তাতে ভালই হয়েছে। এতে এত অধীর হবার কি আছে? আপনার ছেলে আজও বেঁচে বর্তে আছে, সে আপনার চোখের সামনেই বসে রয়েছে।'

সকলেই সন্ন্যাসীকে অবাক হয়ে দেখতে থাকে। তারা সন্ন্যাসীর সেই চেহারার মধ্যে তাদের রাজকুমারের মিল খুঁজে পায়। তারা সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করতে গেলে সন্ন্যাসী ধুনি থেকে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সে বলে: 'রাজা, আমি এই পৃথিবীর মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছি, এখন আর আমরা আগের বাপ-ছেলে হতে পারি না। তবে নিরাশ হবেন না, আপনার ছেলে যেখানেই যাবে সেখানে আপনার বংশেরই মহিমা বাড়াবে। যেখানেই পূরন যোগীর সুখ্যাতি হবে, সেখানেই লোকে রাজা সলবানকেও স্মরণ করবে। এই রাজ্যপাট কিছুই চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু ধর্মের কাহিনী যুগযুগান্ত ধরে অমর হয়ে থাকে।'

লূণা বলে, 'আমার জন্যেই রাজপ্রাসাদ একদিন শূন্য হয়েছিল, যতক্ষণ না এবার রাজার ছেলে মহলে ফিরে যাবে ততক্ষণ আমিও আর সে প্রাসাদে পা রাখবো না। আমার সন্ন্যাসী ছেলে, যতদিন না তুই ঘরে ফিরে আসবি, আমার মাথা থেকে এই কলঙ্কের বোঝা নামবে না। যদি দয়াই দেখাতে চাস তো সব অপরাধ মাফ করে নিজের ঘরে ফিরে চল্।'

যোগী তার ভিক্ষার পাত্র থেকে একটা চালের দানা তুলে লূণাকে দিয়ে বলে, 'মা যাও, ঘরে ফিরে যাও, তোমার সাথে সাথে তোমার ছেলেও ঘরে যাবে। এই শস্য শ্যামল বাগানের মতই তোমার কোল একদিন ভরে উঠবে।'

রাজা বলেন, 'বাবা পূরন! তুইও ঘরে ফিরে চল, তোকে ছাড়া আমার শূন্য ঘর কোনদিনই ভরবে না।'

উত্তরে পূরন জানায়: 'রাজা, ঘরে ফেরা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাদের কাছে আজ আমি মৃত। আর আমার মুখের কথা বিফল হবার নয়, আপনার সংসারে আবার সন্তান আসবে তবে তাকেও আপনি ঘরে ধরে রাখতে পারবেন না। মা ইচ্ছারাঁর মত লূণা মাকেও ছেলের শোকে কান্নাকাটি করতে হবে।'

কিছুদিন বাদে লূণার কোলে রসালুর জন্ম হল। জ্যোতিষীরা জন্মের লগ্ন দেখে

পরামর্শ দিলেন যে একেও এর বাবা-মার কাছ থেকে বারো বছর আলাদা করে রাখা দরকার, কারণ এরও গ্রহ-নক্ষত্র পূরনের গ্রহ-নক্ষত্রের মত প্রায় এক। জ্যোতিষীরা আরো বললেন, 'রাজপুত্র যেমন শক্তিশালী বীর যোদ্ধা হবে, অন্যদিকে তেমনি সন্ন্যাসীর মত ত্যাগী এবং নির্লিপ্ত হবে।'

রসালুকেও মাটির নীচে কুঠরীতে নামিয়ে দেওয়া হল। তার জন্যে আলাদা দাসী-বাঁদী চাকর চাকরানী রাখা হল। বারো বছরের খরচাপত্র প্রভৃতি দেয়া হল। যেদিন রসালুর জন্ম হয়, সেদিন রাজার আস্তাবলে একটা ঘোড়ারও বাচ্চা হয়েছিল। ঘোড়ার বাচ্চার নাম রাখা হল 'ফৌলাদী'। তারও লালন পালনের ব্যবস্থা রসালুর সঙ্গেই করা হল।

□

রসালু দিনে দিনে বড় হতে থাকে। বারো বছর কেটে যাবার পর সে মাটির নিচের কুঠরী থেকে বাইরে আসে। সে যেমনি রূপবান, তেমনি স্বাস্থ্যবান। ওস্তাদেরা তাকে সবরকমের রাজকাজের ব্যাপারে পারদর্শী করে তুলেছে। ঘোড়ায় চড়া, তীর ছোঁড়া, তলোয়ার চালানো প্রভৃতিতে সে এখন বিশেষভাবে নিপুণ। বাড়ীর বাইরে শিকার করে আর বাড়ীতে পাশা খেলে তার দিন কাটতে থাকে।

যৌবনে পদার্পনের পর হঠাৎ তার গুলতি ছোঁড়ার শখ হল। গাঁয়ের মেয়ে বউয়েরা কুয়ো থেকে জল আনতে গেলে রসালু গুলতি মেরে তাদের ঘড়া ফুটো করে দেয়। চোখের পলকে একই ঘড়ার গায়ে দশ বারোটা ফুটো করে দিত সে। ঝরঝর করে চারধার দিয়ে জল বেয়ে পড়ত। সে যেন এক স্বপ্নে দেখা অলৌকিক দৃশ্য। কিন্তু রসালুর এই আনন্দ-খেলায় গাঁয়ের লোকেদের লোকসান হতে থাকে। বউয়েরা প্রাসাদে লূণাকে গিয়ে নালিশ জানায়। লূণা তার আদুরে ছেলেকে বারণ করতে পারে না, তাই সে সকলকে মাটির ঘড়ার বদলে পেতলের কলসী দেয় জল ভরার জন্যে। কিন্তু রসালু তার মায়ের থেকে বেশি চালাক। সে এবার গুলতি ছেড়ে তীর ধনুক ধরলে। তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে সকলের কলসী আগের মত ফুটো করে দিতে সুরু করে। প্রজাদের দুঃখের সীমা থাকে না। এবার রাজার কাছে নালিশ গিয়ে পৌঁছল। রাজা তাঁর একমাত্র ছেলেকে বারণ করতে পারেন না বটে কিন্তু প্রজাদের কষ্টও তিনি আর দেখতে পারেন না। তিনি অবিকল ছেলের মত এক মাটির মূর্তি তৈরী করিয়ে তার মুখে চূণকালি মাখিয়ে প্রাসাদের বাইরে রাখলেন। শিকার থেকে ফেরার পথে প্রাসাদের দরজায় রসালু সেই মূর্তি দেখতে পেল। মুখে আর গায়ে চূণকালি। রাজা যে তার ওপর বিরক্ত হয়েছেন এটা সে বুঝতে পারে। তার কপালে যে আর বেশীদিন রাজপ্রাসাদের অন্নজল নেই তা সে জানতে পারে। সে দেশ ছেড়ে চলে যাবার কথা ঠিক করে।

দেখতে দেখতে রাজপুত্রের নির্বাসনের খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। অন্য জোয়ান ছেলেরা রসালুর সঙ্গ নিল। তারা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, নিজের

দেশের বাইরে গিয়ে বাহুবল খাটিয়ে তারা একটা কিছু করে দেখাবে। অন্য এই ছেলেদের মায়েরা লূণার কাছে আবার দরবার করতে ছুটল। তারা সবাই লূণাকে তার নিজের ছেলেটাকে আটকাবার অনুরোধ করে। কিন্তু তীর ততক্ষণে ধনুক থেকে ছুটে গিয়েছে। লূণা প্রাসাদের ছাদে উঠে নিজের নির্বাসিত ছেলেকে দেখার চেষ্টা করে, কিন্তু ধুলোর ঝড় ছাড়া পথে আর কিছুই চোখে পড়ে না।

লূণা কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে উদ্দেশ্য করে ডাকে :

বে তূঁ চলিউঁ দেস বগানে পুত্ত রসালুয়া
বে তূঁ মুড় আ কিসে বহানে পুত্ত রসালুয়া।
কলগী তেরী মিট্টী চ রূল গঈ,
তেরে নক্সা না জাণ-পছাণে, বে পুত্ত রসালুয়া।
তিখ্খী ছুরি কলেজে ধাণি
জা বৈঠী দিল দেখানে, বে পুত্ত রসালুয়া।
পিচ্ছে তাঁ ছড্ড গিওঁ, বলদিয়াঁ লাটাঁ,
বেতূঁ বন্ন গিয়োঁ অগ্গ দে গানে, বেপুত্ত রসালুয়া।[1]

কোন প্রলোভনেই রসালু আর পিছু ফিরে দেখে না। শিয়ালকোট থেকে বেরিয়ে সে গুজরাটে গুর্জরদের রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হল। রাজা শহরের বাইরে এসে রসালুকে অভ্যর্থনা করে জানতে চায় :

কিস রাজে দা পুত্তর হৈঁ,
তে কী হৈ তেরা নাম।
কেহড়া তেরা দেস সোণিয়াঁ
কেহড়া নগর গ্রাম ?[2]

রসালু জবাব দেয় :

মৈ রাজে সলবান দা পুত্তর
মেরা নাম রসাল
মেরা তাঁ হুণ দেঁস না কোঈ
পিয়ো দা দেঁস সিয়াল।[3]

1. বাছা রসালু, তুই কোন অজানা দেশে চলে গেলি। আর বাছা, কোন একটা ছুঁতো করে আয়। তুই ফিরে আয়। তোর উষ্ণীষের পালকগুচ্ছ ধুলোয় নষ্ট হয়ে গেল। তোর চেহারা আর চিনতে পারা যাচ্ছে না, তীক্ষ্ণ ছুরি ছুটে এসে বুকে বিঁধেছে। তুই চলে গেলি, পেছনে রেখে গেলি জল ও আগুন আর বিরহের জ্বালা।

2. কোন রাজার ছেলে তুমি, কি তোমার নাম ? হে সুকুমার তরুণ, দেশ কোথায়, কোন শহর থেকে তুমি এসেছ ?

3. আমি রাজা সলবানের ছেলে। আমার নাম রসাল। আমার নিজের এখন কোন কোন দেশ নেই। পিতার দেশের নাম সিয়াল।

গুর্জর রাজ বুঝতে পারেন, রসালু জেদী ছেলে। তিনি বললেন, 'নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে যদি কিছু অর্জন করতে চাও তো ঝিলামের দিকে যাও। সে দেশের একের চারভাগে তোমাদের দাবী রয়েছে। তোমার বাবা দীর্ঘদিন নিঃসন্তান ছিলেন বলে তার দাবী কোনদিন কায়েম করেন নি।'

ফৌলাদীর পিঠে চেপে রসালু সামনের দিকে এগিয়ে যায়। হাতে তার দু'মণ ওজনের ধনুক। এই ধনুকের এমন গুণ যে একসাথে তিনটে তীর ছোঁড়া যায়—তারা নিজেদের লক্ষ্যভেদ করে আবার ফিরে আসে। রসালু ঝিলামের দুর্গ মুহূর্তের মধ্যে জয় করে নেয়। সঙ্গীদের মধ্যে একজনকে সেখানকার রাজা করে সে আবার এগিয়ে চলে। অন্য সঙ্গীরা তার সঙ্গে যেতে চাইলে সে তাদের বলে, 'তোমরা সকলে এখানে থাকো। তোমাদের ছাড়া ও একা রাজ্য চালাবে কি করে? এখন থেকে আমি একলাই যেতে চাই। সঙ্গী হিসেবে আমার সঙ্গে কেবল দুজন থাকবে, আমার ঘোড়া ফৌলাদী আর তোতাপাখী শাদী।'

রসালু একের পর এক দেশ জয় করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকে আর ওদিকে রাজা সলবান ক্রমশঃ আরো বুড়ো ও অথর্ব হতে থাকেন। শরীরের খাঁচা থেকে যেকোন দিন প্রাণ পাখী উড়ে গেলেই সিংহাসন শূন্য পড়ে থাকবে। রাজা ছেলেকে ফিরে আসবার জন্যে খবর পাঠাতে লাগলেন। রসালু এখন অমুক দেশে আছে খবর পেয়ে দূতেরা যখন সেখানে পৌঁছল তো দেখা গেল, রসালু সে দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। ফলে রাজার খবর আর ছেলের কাছে পৌঁছয় না। দূতেরা বিফল হয়ে ফিরে আসে। একবার রাণী লূণা খবর পাঠালেন, কিন্তু সে খবরও রসালুর হাতে পৌঁছল না। শেষে ইচ্ছারাঁ তাঁর নিজের ছেলে পূরনের নাম স্মরণ করে রসালুকে দেশে ফেরার জন্যে সংবাদ পাঠালেন। ভগবানের কৃপায় সে খবর ঠিক রসালুর কাছে গিয়ে পৌঁছয় এবং সে ঘরে ফেরার জন্যে রওনা হয়। রাজা সলবান তাঁর মন্ত্রী মোতীরামের মেয়ের সঙ্গে রসালুর বিয়ের সম্বন্ধ খুব অল্প বয়সেই পাকা করে রেখেছিলেন। রসালু বাড়ীর পথে ফিরছিল। শহরের বাইরে কুয়োয় জল ভরতে গিয়ে যুবতী মেয়েরা নিজেদের হাসি ঠাট্টা করছিল। রসালুকে কেউকেটার মত ভাব দেখিয়ে সেখান দিয়ে যেতে দেখে তাদের মধ্যে একটি মেয়ে ব্যঙ্গ করে বলে ঃ

> বে ঘোড়ী দে অসবারা
> ফন্ডে তাঁ তেরে উড্ডন হবা বিচ
> সাড লৈ কুড়ী দে বাঁগ
> হায় বে, ঘোড়ী দেয়া অসবারা
> জে ফন্ডিয়া তো তৈনূঁ ফড়িয়া কিসে নে
> পুট্টণ নহীঁ দেনী লাঁঘ।[1]

1. ওরে ও ঘোড়সওয়ার! তোর চুল যে হাওয়ায় উড়ছে। মেয়েদের মত তুই খোঁপা বেঁধে নে। ও ঘোড়সওয়ার, কেউ যদি চুলের ঝুঁটি ধরে টান মারে তো একপা-ও আর এগোতে পারবি না।

রসালু সাথে সাথেই জবাব দেয় :

জাঁ তাঁ অপনী মোড় লৈ বোলী
নহীঁ তাঁ হোণ না দেবাঁ তেরা কাজ
টুট্ট জায়ে তেরা চূড়া-বীড়া
ধরেয়া রহ জায়ে দাজ[1]

মেয়েটির এক তো যৌবনের আত্মঅহমিকা, তার ওপর সে মন্ত্রীর মেয়ে। সে কি কখনো নিজের কথা ফিরিয়ে নিতে পারে? প্রচণ্ড অহঙ্কারের সঙ্গে রসালুর দিকে একবার তাকিয়ে সে পেছন ফিরে রওনা দেয়।

বাড়ীতে পৌঁছে রসালু বাবা-মাকে বলে, 'যে কাজের জন্যে আমাকে ডেকেছো তা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নাও, আমি তোমাদের এই কয়েদখানার মধ্যে বেশিদিন বন্দী থাকতে পারবো না।' বাবা-মা ভাবল, ছেলের বিয়ে দিই। বাড়ীতে বউ এলে ঘরে ছেলের মন বসবে। পরের দিনই রাজা বরযাত্রী নিয়ে মন্ত্রী মোতীরামের বাড়ী এসে উপস্থিত হলেন। মেয়ে সেজেগুজে বিয়ের পিঁড়িতে এসে বসে। পুরোহিত দুজনের কাপড়ে গাঁটছড়া বেঁধে দিলেন। সপ্তপদী শুরু হল—চারপাক হয়ে গেছে, আর তিনপাক মাত্র বাকী। এবার কনেকে পিছনে রেখে বরের এগিয়ে যাবার কথা। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার আগে রসালু মুখ ঘুরিয়ে কনেকে একবার তাকিয়ে দেখে। চারচোখের মিলন হল। দুজনেই দুজনকে চিনতে পারে। পলকের মধ্যে রসালু খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিয়ে গাঁটছড়া কেটে দু'টুকরো করে দেয়। বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গিয়ে উঠোনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ফৌলাদীর পিঠে গিয়ে বসে। বরপক্ষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই রসালু সহর ছেড়ে ততক্ষণ বেশ দূরে চলে গিয়েছে। রাজা চীৎকার করে বলেন, 'ওরে মাথায় রাজ তিলকটা তো লাগিয়ে যা, আজ থেকে এদেশের রাজা তুই।'

রাজা রসালু চলতে চলতে এক গভীর জঙ্গলে এসে উপস্থিত হলেন। জায়গাটা ভীষণ গরম হলেও চারধারে বেশ সুগন্ধ ছড়িয়ে ছিল। একটু এগোতেই তিনি দেখলেন একটা চন্দন গাছে আগুন লেগেছে। অল্পক্ষণ বাদেই একটা হাঁস গাছ থেকে বেরিয়ে রাজার পায়ের কাছে এসে পড়ে। আগুনে তার ডানা পুড়ে গেছে। হাঁসের অবস্থা দেখে রাজার মনে খুব কষ্ট হল। তিনি হাঁসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গাছে আগুন লাগতেই তুই উড়ে গেলি না কেন?' হাঁস উত্তর দেয়, 'সারাজীবন যে গাছের রস খেয়েছি যার ঠাণ্ডা ছায়ায় বিশ্রাম করে আনন্দ পেয়েছি আজ তার বিপদের দিনে তাকে ছেড়ে পালাই কি করে?' রাজা নিজে খাল কেটে নদীর জলের ধারা গাছের দিকে ফেরালেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন সেই গাছের কষ্ট দূর হয়। আগুন নিবে যেতেই হাঁস আবার গাছের ডালে গিয়ে বসে।

1. হয় তোমার কথা ফিরিয়ে নাও, নইলে আমি তোমার বিয়ে হতে দেবো না। তোমার কঙ্কন ভেঙে পড়বে এবং বরপণ বাড়ীতেই রয়ে যাবে।

হাঁস আর চন্দন গাছের এই প্রেম নিষ্ঠা দেখে রাজার অন্তর খুশীতে ভরে ওঠে, অথচ তিনি নিজেই অল্পকাল মাত্র আগে সমস্ত প্রেম-অনুরাগ ছিন্ন করে চলে এসেছেন। রাজা যাবার উপক্রম করতেই হাঁস বলে ঃ

কলমুকল্লা ভোবে পালেয়োঁ, কল্লে তেরে রাহ
কলমুকল্লে জঙ্গল থানী, কল্ল-কল্লা জা[1]

□

রাজা চলতে থাকেন। কিন্তু জঙ্গল আর শেষ হয় না। পরের দিন সকালে পথের ধারে একটা সাপকে পড়ে থাকতে দেখলেন রাজা রসালু। ধুলোর ঝড় হওয়াতে চোখে বালি ঢুকে সাপ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে সাপ বুঝতে পারে পথ দিয়ে মানুষ কেউ যাচ্ছে। সে মিনতি করে বলে, 'হে পথিক, আমার কথা একটিবার শোনো ; দয়া করে আমার চোখের কাঁকড বার করে দিয়ে যাও। হে ধর্মাত্মা, তোমার পুণ্য হবে।'

সাপ মানুষের চিরশত্রু। কিন্তু বাড়ী থেকে এতদূরে এসে রাজা শত্রুমিত্রের কোন প্রভেদ করতে চাইলেন না। তিনি নিজের হাতে বাসুকী নাগের চোখের কাঁকড় বার করে দিলেন। সাপের চোখ ঠিক হয়ে গেল। রাজা যাবার জন্যে পা বাড়াতেই সাপ কিন্তু ফণা তুলে পথ রোধ করে দাড়ায়। রাজা বললেন, 'উপকারের এই প্রতিদান নাকি?' সাপ মাথা নত করে জানায়, 'আমি কেবল এটুকুই বলতে চাইছিলাম যে আজকের রাতটা আমার বাড়ীতে কাটিয়ে যান।' রসালু আমন্ত্রণ স্বীকার করলেন। সাপের গুহায় গিয়ে সেই বাহাদুর বীর একই খাটে সাপের সঙ্গে শুয়ে রাত কাটালেন। পরের সকালে সাপ অন্যকে কামডানোর জন্যে ঘাসের আড়ালে লুকোতেই রাজা আবার নিজের পথ ধরলেন।

জঙ্গল পেরিয়ে রাজা নীল শহরে এসে উপস্থিত হলেন। শহরের বাইরে এক বুড়ী বসেছিল। সে কখনও কাঁদে আবার কখনো হাসে। রসালু তার দুঃখের কারণ জানতে চাইলেন, কিন্তু কোন কথা না বলে আগের মতই হাসতে-কাঁদতে থাকে। কিন্তু রসালু তার পিছু ছাড়েন না। বুড়ী শেষ পর্যন্ত জানাল, 'এই শহর এখন এক দৈত্যের কবলে। তার খাবার জন্য একটা করে মানুষ দরকার হয়। তাই লোকে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে, অনেককে দৈত্য খেয়ে নিয়েছে। বাকী যারা রয়েছে তারা মৃত্যুর দিন গুনছে। আমার সাত ছেলে ছিল। ছজন আগেই দৈত্যের পেটে চলে গেছে, আজ সাত নম্বরের পালা। আমি এই ভেবে হাসছি যে, আমি এখনও বেঁচে রয়েছি বিপদ থেকে। আর কাঁদছি এই জন্যে যে আমি নিজের হাতে সাত

1. তুই মাটির নীচে কুঁড়েতে একলা মানুষ হয়েছিস। পথও তোর সঙ্গীহীন। এই নির্জন জঙ্গলে তোকে একলাই যেতে হবে।

ছেলেকে বলির হাড়িকাঠে তুলে দিলাম।' রাজা এতদিন গাছ, পাখী আর সাপের উপকার করেছিলেন, আজ মানুষের উপকার করার সুযোগ এসেছে। এ ব্যাপারে জীবনের আশঙ্কা থাকা সত্বেও রাজা স্থির করলেন বুড়ীর ছেলের বদলে তিনি নিজে দৈত্যের আহার হিসেবে যাবেন।

রসালু ঘোড়ায় চেপে আবার জঙ্গলে ফিরে গেলেন। শহরের লোকেরা দৈত্যের খাওয়ার জন্য একগাড়ী রুটি আর একটা ষাঁড়ও পাঠাতো। সে সবের সঙ্গে আজ রাজাও গেলেন। দৈত্য একজন ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখে, অন্য সমস্ত জিনিষের সঙ্গে একটা ঘোড়াও খেতে পাবে ভেবে খুব খুশি হল। সে ঘোড়ার দিকে হাত বাড়াতেই রাজা নিমেষে তলোয়ার চালিয়ে তার হাত কেটে দিলেন। চীৎকার করতে করতে সে সেখান থেকে তার বাড়ী পালিয়ে গেল। কিন্তু আজ আর তাঁর বাঁচবার কোন উপায় ছিল না। দৈত্য গাছের আড়ালে লুকোয় কিন্তু রসালুর তীর গাছ ভেদ করে সেদিকে গিয়ে পোঁছয়। সে তার ছেলেদের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠাল। কিছু ছেলে রাজার তলোয়ারের ঘায়ে কাটা পড়লো আর বাকীদের রাজা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন। তখন দৈত্য আর কোন উপায় না পেয়ে বাড়ীতে পালিয়ে গিয়ে লোহার বড় বড় সাতটা কড়াইয়ের পেছনে গিয়ে লুকোয়। কিন্তু বীর রসালু এক তীরে সেই সাতটা কড়াই ভেদ করে দৈত্যকে শেষ করে দিলেন। দৈত্যকে সপরিবারে মেরে ফেলাতে রাজাকে নিয়ে শহরে খুব সোরগোল শুরু হয়ে যায়। শহরের সমস্ত লোক তাদের নিজের দেশের রাজাকে নিয়ে রসালুকে দেখতে আসে। শহরের লোকেরা রসালুকে কিছুদিন তাদের দেশে ধরে রাখতে চায়, কিন্তু রসালু এক জায়গায় বেশিদিন স্থির হয়ে বসে থাকার পাত্র নয়। সেখানকার রাজার মেয়ে রাজকুমারী শৌক্বিনী তার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়ে, কিন্তু রসালু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। রসালু চলে যাবার উপক্রম করতে শৌক্বিনী গভীর দুঃখে বলে :

চন্নন চীরাঁ, চিখ বঁহা, ফূক লগাবাঁ অগ্গ,
বে সোহ্নে পরদেসিয়াঁ, মৈঁ মরাঁ তেরে গল্ল লগ্গ।[1]

কিন্তু এমন ভালবাসাও রাজাকে আটকাতে পারে না। তিনি যেন এক ধরণের বিবাগী হয়ে যোগীর জীবন কাটিয়ে চলেছেন। তিনি জবাব দিলেন—'তোমরা যেমন সংসার করতে ভালবাসো, যোগীও তেমনি ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে।'

□

সেখান থেকে চলতে চলতে অটকের কাছে নদীর ধারে সিরীকোট শহরে রাজা এসে উপস্থিত হলেন। সে দেশের রাজার নাম সিরকপ। সেই রাজার একটা

1. চন্দন কাঠের চিতা সাজিয়ে আমি তার ওপরে বসে নিজের হাতে আগুন জ্বেলে দেবো। হে রূপবান বিদেশী, আমি তোমার কণ্ঠলগ্না হয়ে মৃত্যু বরণ করতেও রাজি আছি।

অদ্ভুত সখ ছিল। শহরে নতুন কোন বিদেশী এলেই রাজা তার সঙ্গে মাথা বাজী ধরে পাশা খেলতো আর ছলে বলে কৌশলে খেলায় তাদের হারিয়ে গর্দান কেটে নিত। রসালু রাতের বেলা শহরে এসে পৌঁছেছিলেন, পথে তার ঘোড়ার ক্ষুরের সাথে এক কঙ্কালের ঠোক্কর লাগে। রাজা বুঝতে পারলেন, যে শহরের রাস্তায় মৃতদেহ পড়ে থাকে সেখানে থাকা বিশেষ নিরাপদ নয়। এটা যে জুয়াখোর সিরকপের রাজ্য তাও রাজা চিনতে পারলেন। রসালুর নিজের প্রাণের কোন মায়া ছিল না। তিনি স্থির করলেন সিরকপের সঙ্গে পাশার বাজী খেলবেন। ভোর বেলা রাজা রসালু রাজমহলের দিকে রওনা হলেন। তাঁর মত সুদর্শন এক ঘোড়সওয়ার রাজার হাতে প্রাণ হারাবে ভেবে শহরের লোকেদের মন খারাপ হয়ে যায়। এক রূপবতী তরুণী ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে থামিয়ে বলে :

নীলে ঘোড়ে বালেয়াঁ রাজা, নীবেঁ নেড়ে আ,
অগ্গে রাজা সিরকপ্প হৈ, সির লৈসী ওহ লাহ,
ভলা চাহেঁ জে আপনা, তাঁ পিচ্ছে মুড় জা।[1]

কিন্তু রাজা সেকথা না শুনে জোর কদমে ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে যান। রাজা রসালুর চেহারা দেখে শহরের সকলের মনেই অনুকম্পা জাগে। প্রত্যেকেই নিজের সাধ্যমত, বুদ্ধিমত রাজাকে বাজী জেতার উপায় জানাতে থাকে। তার মঙ্গল কামনায় কেউ কেউ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। একজন তার প্রিয় পোষা বেড়ালটা রাজার পকেটে রেখে বলে :

ঠহর বে রাজা ভোলিয়াঁ, সাডী এনী গল্ল সুনজা,
জদোঁ ডাঢ়ী ভীড়া আবনে, তেরী পেশ না জাবে কা,
দাহিনা দস্ত উঠায়ে কে অপনী জেব চ পা।[2]

রসালু রাজপ্রাসাদে এসে পাশা খেলার বাসনা প্রকাশ করলেন। সদরে চোদ্দটা ঢোল রাখা ছিল। রাজার সঙ্গে পাশা খেলতে এলে এই ঢোল বাজিয়ে রাজাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা দরকার। ঢোল গুলো এমনভাবে তৈরী যে একবার তাতে ঘা দিলেই তার আওয়াজ অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা যায়। ফলে যে বাজাত, সে ঘাবড়ে যেত। যে মানুষ প্রথমেই ঘাবড়ে যায় সে বাজী জিতবে কি করে? পাহারাদার রসালুকে ঢোল বাজাতে বলে। রাজা একের পর এক ঢোলে এত জোরে ঘা মারলেন যে নাকাড়া ফেঁসে গিয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে যায়।

সদর পেরোবার পর সিরকপের সত্তরজন মেয়ের দোলনা ছিল—তা দেখে

1. হে নীল ঘোড়ার রাজা, কাছে এস বলি। সামনেই রাজা সিরকপ থাকে, সে তোমার ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে নেবে। নিজের ভাল চাও তো ফিরে যাও।

2. হে ভালমানুষ রাজা, আমার একটা কথা কেবল শুনে যাও, যখন ঘোর বিপদে তোমার কোন বুদ্ধি আর কাজে লাগবে না, সে সময়ে ডান পকেটে হাত দিও।

আগন্তুকের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। মেয়েরা সকলে রসালুকে বলে—'আমাদের একটু দোল দিয়ে যাও।' রাজা বললেন, 'আমার হাতে এখন সময় নেই—সকলকে একসাথে দোল দেবো।' সত্তরটি মেয়ে একসাথে দোলনায় চেপে চেপে বসে। রসালু প্রচণ্ড বেগে দোল দিয়ে তাদের একেবারে আকাশে তুলে দিলেন। নাবার পথে দোলনায় এমন সজোরে তলোয়ারের কোপ লাগালেন যে দোলনা মাঝখান দিয়ে দু'টুকরো হয়ে গেল, আর মেয়েরা সব আহত হয়ে মাটিতে চারধারে ছিটকে পড়ল।

রসালু এবার দরবারের দিকে এগোলেন। তিনি রাজার কাছে পৌঁছনোর আগেই ঢোল ফাঁসানো আর মেয়েদের আহত হবার খবর সিরকপের কানে গিয়ে পৌঁছয়। রসালুর বদলে রাজা সিরকপ নিজে এবার ভয় পেয়ে যায়। তার একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। খেলা আরম্ভ হবার আগে সিরকপ মন্ত্র বলে :

দীবে দে নিম্মে চানণ চৌপড়
রাজে খেডডন দো
আনী সঈয়ে হোণিয়ে, তূ মেরে বল্ল হো
হুকুম জো রাজে সিরকপ্প দা, নরদাঁ মন্নন সো[1]

সিরকপ পাশার দান ফেলার আগেই রাজা রসালু বলে ওঠেন, 'রাজা তোমার শুরুই আজ অশুভ সংকেতের মধ্যে হয়েছে। সমস্ত কাজ পরমাত্মার নাম নিয়ে আরম্ভ করা উচিত ঃ'

দীবে দে নিম্মে চানণ চৌপড়
রাজে খেডন দো
আনী মাতা হোণিয়ে, তূ মেরে বল্ল হো
হুকুম জো সচ্চে সাহব দা, নরদাঁ মন্নন সো[2]

পাশা খেলার সময় রাজা সিরকপ রাণী আর রাজকুমারীকে তার দুপাশে নিয়ে খেলতে বসে। তারা তাদের রূপের ছটায় খেলুড়ের মন তাদের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। খেলুড়ে রাণীর দিকে তাকালে মেয়ে পাশার দান পাল্টে দেয় আর মেয়ের দিকে তাকাবার সময় রাণী পাশার ঘুঁটি সরিয়ে দেয়। কিন্তু রাজা রসালুর মনে অখণ্ড যোগী একাগ্রতা, আর রূপে তিনি নিজেই রাণী-রাজকুমারী দুজনের থেকেই দ্বিগুণ রূপবান।

খেলা শুরু হতে সিরকপের কোন চাতুরীই কাজে আসে না। রসালু যেন অটল ধ্যানে বসেছেন। রাজা সিরকপ প্রথম চাল হেরে যায়।

1. প্রদীপের আলোয় দুই রাজা পাশা খেলতে বসেছে। হে সখী হোণী, তুমি আমাকে বল দাও। রাজা সিরকপের হুকুম পাশা পর্যন্ত মেনে চলে।
2. প্রদীপের নরম আলোয় দুই রাজা পাশা খেলতে বসেছে। হে মাতা হোণী, আমাকে বলে দাও। যে প্রকৃত খাঁটি মানুষ তার হুকুম মেনে চলে।

দ্বিতীয় চালের খেলা শুরু হয়। রাণী আর রাজকুমারী পরাজয় মেনে নিয়ে সেখান থেকে উঠে যায়। তাদের জায়গায় ধাঁধা বলার লোকরা এসে বসে। রসালু যখন কোন চাল ভাবতে থাকে অমনি তারা একটা না একটা শক্ত ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে থাকে। রাজা একসঙ্গে পাশার দান চালেন এবং হেঁয়ালীরও জবাব দেন।

একের পর এক ধাঁধা রাজাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে তারা, কিন্তু রাজা তার থেকেও বেশি জটিল উত্তর দেন। হেঁয়ালী সব বিফল হতে দেখে হেঁয়ালী বলার লোকেদেরই ধরে মাথা থাকবে কিনা সে ভাবনা শুরু হয়ে যায়। তারা সেখান থেকে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে। সিরকপ দ্বিতীয় দানও হেরে যায়।

এবার শেষ বাজী। সিরকপের তখনো একটা চাতুরী বাকী ছিল। বাজী শুরু হবার আগে সিরকপ তার পোষা দুটো ইঁদুর নিয়ে আসে। তার পাশার ওপর দিয়ে যাবার সময় ঘুঁটি সরিয়ে যেত। রসালুর বরাত উল্টো খাতে বইতে শুরু করে। কিন্তু কে জানে কেন হঠাৎ তার সেই দয়ালু লোকটির কথাকটি মনে পড়ে যায়। রাজা তাঁর ডান হাতটা পকেটে ঢোকালেন। পকেট থেকে বেড়ালটা বেরিয়ে আসে। সিরকপের ইঁদুরেরা গর্তে গিয়ে ঢোকে। খেলা আবার রসালুর অনুকূলে আসতে থাকে। সিরকপ ভয় পেয়ে যায়।

রাজা সিরকপ মাথা বাজী রেখে খেলার দান হেরে যায়। ঠিক সেই সময়েই লোকে এসে খবর দিলে যে রাজার একটি মেয়ে হয়েছে। রাজা হুকুম করল হতভাগী মেয়েটাকে যেন তখুনি শেষ করে ফেলা হয়। কিন্তু রসালু বলেন, 'যে রাজা তার নিজের মাথা হেরে বসে আছে সে অন্যের মাথা কাটার হুকুম দেয় কি করে? এই রাজকুমারীকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। রসালু তখনো পর্যন্ত বিয়ের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে চাইছিলেন না। যে মেয়ে আজ জন্মেছে সে যুবতী হয়ে ওঠা পর্যন্ত অন্তত তিনি স্বাধীন জীবন কাটাতে পারবেন। রসালু দয়াপরবশ হয়ে সিরকপের প্রাণ ভিক্ষা করে দিলেন। কেবল একটা শর্ত থাকলো যে এর পর থেকে সিরকপ আর কখনো বাজী ধরে পাশা খেলতে পারবে না। এতক্ষণ প্রাসাদে থাকার জন্যে রাজার মনে হতে থাকে তাঁর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। তিনি খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন। বন্দীশালার পাশ দিয়ে যাবার সময় কয়েদীরা হৈ চৈ করতে শুরু করে—

হোর রাজে মুর্গাবিয়াঁ, তূঁ রাজা শাহবাজ,
বন্দীবানাঁ দে বন্দ খলাস কর; তেরী উম্র দরাজ।[1]

রাজা রসালু নিজের হাতে কারাগারের দরজা খুলে দিলেন। বন্দীরা রাজাকে

1. অন্য রাজারা একটা পাতিহাঁস। তুমি ধন্য খেলোয়াড়। বন্দীদের এই বন্ধন থেকে মুক্তি দাও। তুমি দীর্ঘায়ু হবে।

আশীর্বাদ করতে করতে বেরিয়ে এল। রাজা সেখান থেকে খেড়ী মূর্তির পাহাড়ে এলেন। সেখানে তিনি একটা প্রাসাদ বানালেন। প্রাসাদের সদরে একটা আমের চারা পুঁতে বললেন, 'এই গাছে যেদিন প্রথম মুকুল ধরবে রাজকুমারী কোকলাঁও পূর্ণ যুবতী হবে। সে সময়ে তাকে আমি বিয়ে করবো।'

□

কোথাও কিছুদিন স্থির হয়ে বসে থাকা রসালুর ধাতে নেই। তিনি শিকার নিয়ে এমন মেতে উঠলেন যে তা থেকে ফুরসৎই পান না। আর কখনো ফুরসৎ পেলেই অন্য কোন গুরুতর কাজ নিয়ে পড়েন। আমগাছে কবে মুকুল ধরলো আর রাজকুমারী কোকলাঁ কবে যুবতী হয়ে উঠলো সে সব দিকে তার কোন খেয়ালই থাকে না। রাজার জীবনযাত্রার কোন পরিবর্তন হয় না। প্রাসাদে কোকলাঁ ছাড়া আর অন্য কোন রাণীও আসে না। বেচারী কোকলাঁ তার নিজের বয়সী কোন পুরুষ কিংবা রমনীর সঙ্গে কথা বলার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। রাজার শিরা-উপশিরায় তখনও শক্তি আর প্রাণ প্রাচুর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। নিজের সেই ক্ষমতা ও শক্তির কাছে যুবতী কোকলাঁকেও তার ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। ফলে রাজা আর রাণীর মধ্যে কোনদিনই প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠল না। তারা দুজনে কোনদিন একত্রে বসে দুটো কথা পরস্পরের ভালো করে শুনলেন না পর্যন্ত। তারা দুজনে একে অন্যের কাছে অচেনা বিদেশী হয়ে থাকলেন।

রাজা রসালু একদিন শিকারে বেরোনর পর অন্য আর এক রাজা শিকার করতে এসে প্রাসাদের কাছে উপস্থিত হল। রাণী কোকলাঁ প্রাসাদের ছাতে উঠে একলা চারধারে বাগ-বাগিচার দৃশ্য দেখছিলেন। নীচে এক অচেনা মানুষকে দেখে তিনি বলেন :

মহলাঁ হেঠ ফিরন্দিয়া, সাধ ফিরেঁ কে চোর ?[1]

নীচে থেকে রাজা জবাব দেয় :

চোরাঁ মৈলে কপড়ে, সাধাঁ নবেঁ নকোর।[2]

নীচে যে রাজা দাঁড়িয়ে ছিল তার নাম হোডী। যে কোকলাঁর উদ্ভিন্ন নবযৌবন দেখে মোহিত হয়ে যায়। কোকলাঁর আচার আচরণে তখনো কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। সে বলে—'রাজার প্রাসাদের ভেতরে এসে ঢোকে, তেমন ক্ষমতা কারুর হয়নি এখনো।'

হোডী প্রাসাদের ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করে। সদর দরজায় পাহাড়ের মত এক বিরাট পাথর রাখা ছিল। রসালু সেটাকে সরিয়ে যাতায়াত করতেন। হোডী

1. প্রাসাদের নীচে কে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো, তুমি সাধু না চোর ?
2. চোরেদের জামা কাপড় অপরিষ্কার হয়, আর সাধুদের পোষাক একেবারে নতুন হয়।

প্রচণ্ড চেষ্টা করেও পাথরটাকে সরাতে পারে না। হোডীর ইচ্ছে করছিল, একটা পাখী হয়ে সে কোকলাঁর কাছে উড়ে চলে যায়। কিন্তু সেটা তো আর তার হাতের বশ নয়। সে কোকলাঁকে দড়ির মই নামিয়ে দিতে বলে, এবং শেষ পর্যন্ত কোকলাঁর মনেও করুণার উদ্রেক হয়। সে নিজেও একলা থাকতে থাকতে অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিল। সে দড়ির মই নামিয়ে দিতে রাজা হোডী উপরে উঠে আসে। এর পরে কোকলাঁর নিজেকে সংযত রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। রসালু বনে জঙ্গলে শিকার নিয়ে মেতে থাকেন আর কোকলাঁ প্রাসাদের বিলাসভবনে প্রেমের খেলায় ডুবে যায়।

পরের দিন হোডীর বিদায় নেবার সময় কোকলাঁ কাঁদতে থাকে। হোডী তার চোখের জল মোছাতে যেতে কোকলাঁর চোখের কাজল তার হাতে লেগে যায়। রাজা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলে, 'আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো। যতক্ষণ তোমার থেকে আলাদা থাকবো, ততক্ষণ এই কাজলের দাগ হাত থেকে মুছতে দেবো না। এ হাত দিয়ে খাওয়া দাওয়া করবো না, এ হাত ধোবনা কখনো, আজ থেকে কোন কাজই এহাত দিয়ে করবো না আর।'

রাজা রসালু ফিরে এসে রাণীর চাল চলনে একটু যেন পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। চুলের খোপা ভেঙ্গে পড়েছে, গলার হার ছেঁড়া, বিছানা অগোছালো। রাজা বলেন :

কিন্ন মেরা খূহা গেড়িয়া, রাণী কিননে ভন্নী নিসার
ঘড়েয়ুঁ পানী কিস ল্যা, কিস সুটে খঙ্ঘার
কৌন মহলাঁ বিট দৌড়িয়াঁ, মহলী পীয়া ধসকার
সেজ মেরী কৌন লেটেয়া, ঢিল্লী পঈ নিবার[1]

রাণী একদিনেই যথেষ্ট চালাক চতুর হয়ে গিয়েছিল। সে বুদ্ধি করে উত্তর দেয়। 'আমিই কূয়ো থেকে জল তুলেছিলাম, আমিই কূয়োর পার ভেঙেছি, ঘড়া থেকে আমি জল নিয়েছিলাম, থুতুও ফেলেছি আমি। চুলের বিনুনি আমিই খুলেছি, হার ছিঁড়েছে টিয়া। আমিই পাগলের মত ছোটাছুটি করেছিলাম, তাতেই মেঝেতে দাগ পড়েছে, শূলে বিদ্ধ হবার মত তীব্র যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে আমিই তোমার বিছানায় শুয়েছিলাম, তাই চাদর আলগা হয়ে গেছে।'

রাজা সে সময়ে চুপ করে গেলেন। কিন্তু তার মনে সেই থেকে সন্দেহ দানা বাঁধতে সুরু করে। এই প্রথম আর তাঁর নিজের রাণীকে অন্য মানুষ বলে ভ্রম হতে থাকে। তার যৌবনের রূপ লাবণ্যে তিনি এক অলৌকিক আগুনের ছটা দেখতে পেলেন। পরের দিন খুব ভোরে তিনি শিকার করতে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু আজ তার

1 ও রাণী, কে আমার কূয়া থেকে জল তুলেছে, কে কূয়োর পার ভেঙেছে, ঘোড়াতে কে জল তুলেছে, কে তাতে থুতু ফেলেছে? প্রাসাদে কে ছুটোছুটি করেছে যার পায়ের ছাপ পড়েছে মেঝেতে? আমার বিছানায় কে শুয়ে ছিল—বিছানার চাদর আলগা হয়ে গেছে।

মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল—বার বার নিশানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যেতে থাকে। জুতোর মধ্যে একটা লুকোনো কাঁকড়ের অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন তিনি—যেন কোন অদৃশ্য শত্রু তার মধ্যে বসে রয়েছে। দুপুর বেলাতেই তিনি প্রাসাদে ফেরার পথ ধরলেন। বিকেলের দিকে প্রাসাদের কাছাকাছি পৌঁছে দেখলেন, একটি লোক দড়ির মই বেয়ে নিচে নামছে আর কোকলাঁ ওপরে দাঁড়িয়ে তাকে বিদায় জানাচ্ছে। রাজা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তিনি প্রচণ্ড জোরে চীৎকার করে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানালেন। হোডী আর রসালু দুজনের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। রসালু বলেন, 'প্রথম সুযোগ দিলাম। নিশানা লাগাও দেখি।' হোডী তীর ছোঁড়ে, কিন্তু এখনি সে শয্যা উপভোগ করে এসেছে, তার তীরে কোন জোর থাকে না। রসালু সেটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন। তিনি বলেন, 'একটু বিশ্রাম নিয়ে আর একবার চেষ্টা করে দেখ।' হোডী আবার তীর ছোঁড়ে, রসালু সেটা ঢাল দিয়ে আটকালেন। রসালুর মানসিক একাগ্রতা ফিরে এসেছিল। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে একটা মাত্র তীর ছোঁড়েন—হোডীর দেহ দু'টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে।

কোকলাঁ ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখছিল। সে বুঝতে পারে, এবারে আর তার মুক্তি নেই। সে প্রাসাদ থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। রসালু নিজের হাতে হোডী আর কোকলাঁর মৃতদেহ তাঁর ঘোড়ার পিঠে বেঁধে ঘোড়াটাকে জঙ্গলের দিকে হাঁকিয়ে দিলেন। বিদায় দেবার সময় মনে মনে বললেন, প্রিয়সাথী ফৌলাদী, তোর সঙ্গে সম্পর্ক এখানেই শেষ হল। আজ থেকে আমাকে জীবনের পথ বদলাতে হবে।

তার নিজের বাবা-মা'র কথা মনে পড়ে আজ। সেই সঙ্গে তাকেও মনে পড়ে যায়, যাকে সপ্তপদীর সময় ত্যাগ করে এসেছিলেন। তাঁর মনে হতে থাকে, শিয়ালকোট যেন ডাকছে তাকে। তিনি সেই শূন্য প্রাসাদের দরজার সামনে পড়ে থাকা পাহাড়ের মত বড় পাথরটা দূরে সরিয়ে দিলেন। প্রসাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু নিজে তিনি সেখান থেকেই পিছু ফিরলেন—পা বাড়ালেন নিজের দেশের দিকে।

বলবন্ত গার্গী

দুল্লা ভট্‌টী

সে সময় সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল। লাহোর শহরের কাছে সান্দলবার এলাকার মুসলমান ভট্টী রাজপুতেরা হঠাৎ একবার বাদশার খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে মোগল সৈন্যরা আক্রমণ করে এবং সর্দার ফরিদ আর তার বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। হাত বেঁধে তাদের আকবরের দরবারে পেশ করে।

বাদশা কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ফরিদ অত্যন্ত উদ্ধতভাবে সে কথার জবাব দিয়ে মোগলদের গালি দিতে থাকে। সম্রাট রেগে আগুন হয়ে হুকুম দিলেন, 'জল্লাদ, এই বিদ্রোহীদের গর্দান নিয়ে শহরের সিংহ-দরজায় টাঙিয়ে দাও। এদের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে সারা দেহে ভূষো কালি মাখিয়ে দাও।

বাপ-ছেলে দুজনেই নিহত হল। সে সময়ে ফরিদের বউ লধ্‌খী পাঁচমাসের গর্ভবতী ছিল। চারমাস বাদে একদিন এক রোববারে তার একটি ছেলে হ'ল। তার নাম রাখা হল দুল্লা।

□

দুল্লা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছিল। চওড়া মাথা, টানা টানা চোখ। আঁতুর ঘরেই দাই ছেলের রূপ দেখে চমকে ওঠে। তার মাথা দেখে বলে, 'এই বীর ছেলে তার বাবার ওপর অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবে।' মা খুশি হয়ে ছেলের মাথায় ছুঁইয়ে মোহর পুরস্কার দেয়, কিন্তু সাথে সাথে ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে।

ঠিক সেইদিনই সম্রাট আকবরেরও একটি ছেলে জন্মেছিল। তিনি তার নাম দিয়েছিলেন শেখু—বড হয়ে যে জাহাঙ্গীর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। সম্রাটের ইচ্ছে ছিল, তাঁর ছেলে যেন বড় হলে নীতিবান এবং প্রকৃত বীর হয়ে উঠতে পারে। জ্যোতিষী দিনক্ষণ বিচার করে নিবেদন করল, 'হুজুর আগে তো আপনি দান-ধ্যান করুন। প্রজাদের মোহর বখশিস দিন। তারপর আপনার সাম্রাজ্যে এমন এক রাজপুত মায়ের খোঁজ করুন যার ঠিক সেই দিনই ছেলে হয়েছে। শাহাজাদা যদি সে-মায়ের দুধ খেয়ে বড় হতে পারে, তাহলে সে অজেয় বীর হবে।'

সম্রাট খোঁজ খবর করতে থাকেন। এক ফকির সম্রাটের দরবারে এসে জানাল,

'শাহনশাহ, যে ফরিদ ভট্টীর আপনি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন তার বৌ লধ্‌ধী যুবতী ও অসীম শক্তিমতী। পুরুষদের মতই তার শরীরে ক্ষমতা। যেদিন শাহজাদার জন্ম হয়েছে, সেই রবিবারে তার ঘরেও ছেলে হয়েছে।'

সে কথা শুনে সম্রাট খুব খুশি হলেন। তিনি সেই বীর রাজপুত মাকে নিজের কাছে আনানোর বদলে সঙ্গে লোকজন দিয়ে শেখুকে সেখানে পাঠালেন। সম্রাটের ছেলেকে লালন-পালনের ভার লধ্‌ধীর ওপর পড়ল। তাদের থাকার জন্য সেই সুবাদে একটা সুন্দর প্রাসাদ তৈরী করে দিলেন সম্রাট। শেখু আর দুল্লা দুজনেই লধ্‌ধীর বুকের দুধ খেয়ে আপন ভাইয়ের মত বড় হয়ে উঠতে থাকে। তারা একসাথে কুস্তি লড়ে, তীর ধনুক ছোঁড়ে, ঘোড়ায় চড়তে শেখে। কিন্তু সব বিষয়েই দুল্লা শেখুকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। ছেলেদের বারো বছর বয়সের সময়ে আকবর তাদের দরবারে ডেকে পাঠালেন। সম্রাটের নির্দেশে বিরাট মাঠে তাঁবু ফেলে শেখু আর দুল্লার মধ্যে তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হল। সারা শহরের লোক সেই প্রতিযোগিতা দেখতে মাঠে ভেঙ্গে পড়ে। ওস্তাদেরা দুজনকে দু'রঙের আলাদা আলাদা তীর দিলেন যাতে একজনের তীর অন্যের সাথে মিলে শেষে গোলমাল না হয়ে যায়। শেখুর তীর এধারে সেধারে গিয়ে পড়ে কিন্তু দুল্লার তীর স্থির লক্ষ্যভেদ করতে থাকে। পরে ঘোড়ায় চড়া এবং তলোয়ার চালানোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল, দুল্লা প্রতিবারেই বিজয়ী হল।

সম্রাট খুবই হতাশ হয়ে গেলেন। তার মন দমে গেল। তিনি লধ্‌ধীকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠিক করে বল, কি ব্যাপার? আমার ছেলে সব কিছুতে হেরে যাচ্ছে কেন? তুমি কি ওকে তোমার বুকের দুধ খাওয়াওনি নাকি? সত্যি না বললে তোমাকে প্রাণের মায়া ছাড়তে হবে।'

লধ্‌ধী করজোড়ে নিবেদন করে, 'আমি ওকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করেছি। নিজের বুকের দুধ খাইয়েই এত বড় করেছি। যদি অপরাধ কোন হয়ে থাকে সে কেবল এই যে, আমার ডান স্তনের দুধ দুল্লাকে খাওয়াতাম আর বাঁ স্তনের দুধ শাহজাদাকে।'

সম্রাট কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'শাহজাদাকে মানুষ করার জন্য তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম—আর এই কাজের জন্য তোমাকে মোহর বকশিস দিচ্ছি। ফিরে গিয়ে দুল্লাকে মানুষ কর। ওকে ভাল করে লেখা পড়া শেখাও। বড় হলে ওকে আমি দরবারে ডেকে এনে জাগীরদার করে দেবো।'

লধ্‌ধী গ্রামে ফিরে এসে দুল্লাকে কাজীর কাছে নিয়ে যায়। কাজীকে শীরনি ভেট দিয়ে সে অনুরোধ করে, দুল্লাকে কাজী যেন ইসলাম ধর্মের আচার আচরণে তালিম দেন এবং সৎ ও ন্যায়ের পথে চলার পথ প্রদর্শন করেন।

কাজীর পড়ানোর কট্টরপন্থী ব্যাপার স্যাপারে বিরক্ত হয়ে দুল্লা একদিন কাজীকেই উত্তম-মধ্যম লাগিয়ে এক ছুতোরের কাছে গিয়ে তাকে একটা গুলতি বানিয়ে দিতে বলে। দুল্লা স্বভাবে কিছুটা অধীর এবং চঞ্চল বেপরোয়া ধরণের।

সে গ্রামের ছেলেদের নিজের দলে টেনে এনে তাদের সর্দার হয়ে বসে। মেয়েরা কুয়ো থেকে জল আনতে গেলে তারা সকলে মিলে তাঁদের ঘড়া ফুটো করে দেয়। দুল্লা আর সঙ্গীরা গাঁয়ে এমন হুজ্জতি করতে শুরু করে যে পাড়ার মেয়ে-বউয়েরা সবাই তিতি বিরক্ত হয়ে ওঠে।

একদিন নন্দী গাইয়ে টিটকিরী দিয়ে বলে, 'তা বাবা, মেয়েদের ঘড়া ভেঙ্গে বীরত্ব ফলাচ্ছিস কেন? এতই যদি বাহাদুর মনে করিস নিজেকে তো বাপ-ঠাকুর্দার ওপরে যে অন্যায় হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নিচ্ছিস না কেন? বাদশা আকবর তোর বাপের মাথা কেটে সদর দরজায় টাঙিয়ে রেখেছিল, তার সঙ্গে একহাত লড়ে আয় না।'

সে কথা শুনে দুল্লার বুকে আগুন জ্বলে ওঠে। মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি ছেড়ে সে এবার হাতে ছোরা তুলে নেয়, সর্দারের রক্ত তার ধমনীতে টগবগ করতে থাকে। সে সোজা তার মার কাছে গিয়ে ছোরা উঁচিয়ে বলে, 'সত্যি করে বল, আমার বাবা কি ভাবে মারা গিয়েছিল? আজ আমাকে একজন ঠাট্টা করছিল।' মা ভয় পেয়ে যায়। সে তার ছেলের চোখে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে দেখে। দুল্লা আবার বলে, 'সত্যি কথা না বললে আমি তোমাকেই খুন করবো আজ। বল্, আমার বাবা, কি ভাবে মারা গিয়েছিল?'

বিধবা মা কাঁদতে কাঁদতে সব কথা খুলে বলে। ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমো খেয়ে বলে, 'তোকে আমি অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে মানুষ করেছি। বাদশার সঙ্গে পাল্লা দিতে যাসনি বাবা।'

দুল্লা প্রচণ্ড রাগে গর্জে ওঠে, 'আমি কাপুরুষ নই। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নেবোই। আমাকে বাবার স্মৃতিচিহ্ন কিছু দাও।'

মা বাড়ীর পেছনের দিকের এক ঘরের তালা খোলে। এই ঘরটাকে সে দুল্লার কাছে এতদিন প্রায় লুকিয়েই রেখেছিল। দুল্লা ঘরের মধ্যে গিয়ে এক কোণে রাখা বল্লমটা হাতে তুলে নেয়। এটা তার বাবার বল্লম, আগুনের শিখার মতই ঝলসে উঠছে যেন। মা বুঝতে পারে, দুল্লা প্রতিশোধ নেবেই। তার যেমন ভয় হচ্ছিল— তেমনি গর্বে বুক ভরেও উঠছিল। ঘরে আরো অনেক তলোয়ার, ছোরা, বর্শা প্রভৃতি রাখা ছিল। একদিকে একটা বড় নাকাড়াও ছিল। মা গরুর কাঁচা দুধ চেয়ে এনে নাকাড়ার গায়ে ছিটিয়ে দেয়। দুল্লা নাকাড়ায় আঘাত করতে সারা বাড়ী গমগম করে ওঠে। সে আওয়াজ গলি আর গ্রামের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে বারো ক্রোশ দূরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

নাকাড়ার সে আওয়াজ দুল্লার অবরুদ্ধ পৌরুষত্বের ঘোষণা, এক রক্তাক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান—আকবরের প্রাসাদের দেওয়ালে গিয়ে তা ধ্বনি তোলে। সম্রাটের কাছে খবর গেল, ষোল বছর বাদে সান্দলবারের সেই নাকাড়া আবার বেজে উঠেছে। কার এতবড় দুঃসাহস যে মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে বাস করে এমন ধৃষ্টতার রব তোলে।



দুল্লা পাঁচশো তলোয়ার আর বল্লম তার সঙ্গীদের মধ্যে ভাগ করে দেয় এবং প্রথমেই মামার বাড়ীর ওপরে চড়াও হয়। তার বাবার গর্দান নেবার সময় তার মামারা যাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসেনি বলে মামাদের ওপরে তার অনেকদিন থেকেই রাগ ছিল। হামলা করতে যাবার আগে সে শপথ নিয়েছিল লুঠের মাল নিজের জন্যে কিছু রাখবে না। মামাদের গরু মোষ সব লুঠ করে এনে সে গ্রামের নাপিত, গাইয়ের দল (ভাঁড়) আর ব্রাহ্মণদের বিলিয়ে দেয়।

এরপর থেকে দুল্লা প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠল। সারা এলাকার কোথাও কোন হত্যাকারীর সংবাদ পেলেই দুল্লা তার সঙ্গে লড়ে তার মালপত্র আর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আসতে থাকে। তার বাহাদুরী এবং দরাজ হৃদয়ের খ্যাতি দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশের এলাকার যত মেয়ে ছিল, সকলেই তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে।

দুল্লার অন্তরে এক অকল্পনীয় অস্থিরতা আর ক্রোধের আগুন জ্বলতে থাকে। তার লুঠপাটের উদ্দেশ্য ঠিক চুরি ডাকাতি করার জন্যে নয়, তার এই জোর জুলুম আর অত্যাচার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার একটা ফন্দি মাত্র। বিদ্রোহের পতাকা এভাবে ওড়ানোর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, মোগল বাদশাকে তার সঙ্গে যুদ্ধে নামার জন্যে প্ররোচিত করে তোলা।

তাকে নজরানা না দিয়ে কারুর তার এলাকা দিয়ে যাবার উপায় ছিল না। সে অলী সওদাগরের পাঁচশো ঘোড়া লুটে নেয়, মৈদে সুদখোরের মালপত্র বোঝাই খচ্চর কেড়ে আনে। আকবরের দরবারে দুল্লার নামে নিত্য নতুন নালিশ পৌঁছাতে থাকে। শেষে বিরক্ত হয়ে আকবর প্রকৃত কারণ জানার জন্য এক বিশেষ গুপ্তচরকে পাঠালেন।

গুপ্তচর জ্যোতিষীর ছদ্মবেশে দুল্লার গ্রামে গিয়ে পৌঁছল। দুল্লা প্রথমে জ্যোতিষীকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করে। কিন্তু যেদিন জানতে পারল সে আসলে গুপ্তচর, অমনি তার দাঁড়ি গোঁফ কেটে তাকে ফেরৎ পাঠাল। গুপ্তচর এসে সবকথা বাদশাকে জানায়। বাদশার এবার রাগ হল। দুল্লার কিনা এতবড় স্পর্ধা! তিনি আদেশ দিলেন, দুল্লাকে যে জীবিত কিংবা মৃত ধরে আনতে পারবে তাকে মণিমুক্তা পুরস্কার দেবেন।

মির্জা নিজামুদ্দীন সৈন্য সামন্ত নিয়ে দুল্লার গ্রাম সান্দলবারের সীমান্তে এসে ঘাঁটি পেতে বসে। গাঁয়ের গুর্জরদের মেয়ে সুন্দরী অন্য যুবতীদের মত দুল্লার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। সে যেমন চালাক চতুর তেমনি দেখতে সুন্দরী। দুধ বিক্রী করার ছল করে ছাউনীতে গিয়ে সে খবর নিয়ে এল যে মির্জা নিজামুদ্দীন দুল্লাকে শায়েস্তা করতে এসেছে।

দুল্লা সে খবর জানতে পেরে সঙ্গীদের নিয়ে নিজেই তাদের আক্রমণ করে বসল। মোগল সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই না করার জন্যে তার মা অনেক কাকুতি মিনতি

করেছিল। কিন্তু বাদশা আকবরকে নির্ভীক দৃঢ়চেতা দুল্লা দেখাতে চাইছিল, সান্দলবারের ভট্ট রাজপুতেরা কারো কাছে মাথা নত করতে শেখেনি।

লড়াই বেশ কিছুদিন ধরে চলে এবং এক সময় নিজামুদ্দীনের সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

আকবর সে খবর পেয়ে বিশাল সৈন্যবাহিনী দিয়ে শেখুকে পাঠালেন দুল্লার মাথা কেটে আনার জন্যে।

শেখুর সৈন্যরা অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে। মোগলদের নাকাড়া ধ্বনিতে সান্দলবার মুখরিত হয়ে ওঠে। আশঙ্কায় লধ্‌ধীর বুক কেঁপে ওঠে। সে শেখুকেও মানুষ করেছে। একদিকে তার পেটের ছেলে দুল্লা আর অন্য দিকে তার বুকের দুধে লালিত শেখু। তাদের দুজনের শরীরই স্বাধীনচেতা রাজপুত দুধে গঠিত—সে দুধ যে একবার খেয়েছে সে অন্যের কাছে মাথা নত করতে জানে না।

লধ্‌ধী কালো বোরখায় নিজেকে ঢেকে শেখুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। তাকে দেখে শেখুর মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। সে মাকে কথা দেয়, দুল্লা যদি এখন থেকে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ছেড়ে দেয় তো সে বাদশাকে রাজী করিয়ে তার মৃত্যুদণ্ড মকুব করিয়ে দেবে।

মা দুল্লার কাছে শান্তির জন্যে মিনতি করে। কিন্তু দুল্লা আর শেখুর মধ্যে যে রক্ত-গঙ্গার ব্যবধান সে রক্ত দুল্লার বাপ-ঠাকুর্দার। সে মায়ের কথা শোনে না, শেখুকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করে, 'তুই যদি আকবরের বেটা হোস তো নেমে আয় ময়দানে। আমার সঙ্গে একা লড়ে যা।'

দুজনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দুল্লার তলোয়ার বিদ্যুতের মত ঝলসে ওঠে। শেখুর শরীরে মোঘল রক্তের তেজ রয়েছে। দুল্লার ওপরে তার চিরকালের আক্রোশ জেগে ওঠে। আগে বহুবার সে খেলার ছলে দুল্লার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। দুল্লার সঙ্গে সে কোনদিন এঁটে উঠতে পারে নি। সেই লজ্জা ও গ্লানি কাটিয়ে ওঠার জন্য শেখু প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালিয়ে যায়। তলোয়ার ঝলসে ওঠে মুহুর্মুহু—রক্তের ধারা বইতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেখুকে হারতে দেখে মির্জা নিজামুদ্দীন আর তার সৈন্যরা একজোটে দুল্লার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শেষ আঘাতটা শেখুই চালায়। তার ছোরা দুল্লার বুকে আমূল বিদ্ধ হয়—ফিনকি দিয়ে রক্তের ধারা ছুটে আসে। সান্দলবারের বিদ্রোহী স্বাধীনচেতা দুল্লা চিরদিনের জন্যে মৃত্যু ঘুমে ঢেলে পড়ে।

যুদ্ধে হেরে গিয়েও কিন্তু দুল্লা লোকেদের অন্তরে চিরকালের জন্যে স্থান করে নেয়। তার সাহসিকতা ও আত্মমর্যাদাবোধের কাহিনী নিয়ে গান রচিত হয়; তার বীরত্বের গল্প কিংবদন্তী হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন থেকে তাঁর গ্রাম 'দুল্লের গাঁ' নামে পরিচিত হয়ে যায়।

দলীপ কৌর টিবানা

জীউণা মৌড়

'ঘর ঘর পুত্ত জন্মদে জীউণা মৌড না কিসে বন জাণা'—অর্থাৎ সব বাড়ীতেই ছেলে জন্ম নেয় বটে কিন্তু জীউণা মৌড় আর দ্বিতীয় জন্মাল না।

বিশেষ পুরোনো দিনের কথা কিংবা নিছক গাল-গল্পও নয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের একদিনের কথা। সেটা গরম কাল। ভর দুপুর বেলা। এক অচেনা লোক সকলের কাছে সাংগ্রুর জেলার মৌড় গ্রামের জমিদার খড়্গা সিংয়ের বাড়ী খোঁজ করতে করতে এসে উপস্থিত হল।

ঠিক বাড়ীতে এসে পৌঁছলেও সে সময়ে খড়্গা সিং বাড়ীতে ছিল না—তার ছেলে জীউণা সিং একলা ছিল।

অপরিচিত লোকটি 'সত শ্রী অকাল (পরমেশ্বরই সত্য)' বলে খাটিয়ায় এসে বসে।

'আমি কালাপানী (আন্দামান) থেকে আসছি...' অপরিচিত লোকটি জানায়। জীউণা দুধ নিয়ে আসে, বেশি করে মিষ্টি মিশিয়ে।

'কিষন তার ভাইকে খবর পাঠিয়েছে, সে যদি এক মায়ের বেটা হয়তো যেন ডোগরাকে জীবন্ত না ছেড়ে দেয়—তাকে প্রবঞ্চনা করে পুলিশের হাতে ধরিয়ে এই দ্বীপান্তরে পাঠানোর সে যেন প্রতিশোধ নেয়।

জীউণা খবরটা শুনে চুপচাপ আপনমনে কাঠি দিয়ে মাটি খুঁটতে থাকে।

'তোর ভাই সবকিছু থেকেই বঞ্চিত আজ, আর সে শালা ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে! আর ভাইয়ের ওপর অন্যায়ের প্রতিশোধ না নিয়ে জীবন ভ'র কাপুরুষের বদনাম মাথা পেতে নেওয়ার কোন মানে হয় না। আত্মসম্মান বোধ না থাকলে মানুষ আর পশুতে কি তফাৎ রইলো? এই দুনিয়া থেকে যাবার সময় সঙ্গে করে কি আর নিয়ে যাবে? বাড়ীর মেয়েরা কিন্তু ভাই, এসব কথার যেন বিন্দু বিসর্গও যেন জানতে না পারে। মেয়েরা কান্নাকাটি করে পুরুষকে অযথা দুর্বল করে দেয়। কিষন বড় বিমর্ষ হয়ে বসেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, তোর খবর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে তবে নিজের ঘরে ফিরবো। আর আমার তো সে সৎ কাকা ছিল—বাবাকে সে পাঁচজনের সামনে গালাগাল দিয়েছিল। বারো ঘন্টার মধ্যে আমি

তার মাথা বৈঠকের চাতালে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। কুড়ি বছর দ্বীপান্তরে কাটিয়ে এলাম, কি এমন ক্ষতি হয়েছে আমার, কিন্তু এখন তো কোন শালা বলতে পারবে না যে বাপকে গালি গালাজ করলো, অথচ তোমরা ঘরের মধ্যে ল্যাজ গুটিয়ে ঢুকে পড়লে...' —অপরিচিত লোকটি একনাগাড়ে বলেই চলে।

সেই রাতেই জীউণা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। ডাকাতের দলে নাম লেখায় সে।

তার মা খুব কান্নাকাটি করল। বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। কিষনের বিচ্ছেদের ব্যথা এখনও সে ভুলতে পারেনি। সিংহের মত সাহসী জোয়ান ছেলেকে কালাপানীতে নির্বাসনে যাবার সময় গাড়ীতে তুলে এসেছিল সে। কে জানে বেঁচে থাকতে থাকতে আর কোনদিন তার মুখ দেখতে পাবে কিনা। সে তখন ভেবেছিল, যাক্ তবু নিশ্চিন্তে থাকা যাবে এবার।

কিষনের জন্য পুলিশ রোজ তাদের বিরক্ত করত। কতবার যে তাকে আর জীউণাকে পুলিশ কিষনের ঠিকানা জানার জন্যে থানায় নিয়ে গিয়ে মারধোর করেছে। কিন্তু তারা আর কি বলবে, কিষনের ঠিকানা তারা নিজেরাই জানতো না।

যখন থেকে কূয়োর পাশের ঘরে কিষনের কাছে আজেবাজে লোকজন আসতে শুরু করেছিল সে নিজেই তা নিয়ে কিষনের সঙ্গে রাগারাগি করেছে। চোলাই মদ তৈরী করতে আরম্ভ করেছিল সে। বাড়ীর আদব কায়দা ছেড়ে গাইয়ে-বাজিয়েদের মত ফুলবাবু হয়ে কিষনের ঘুরে বেড়ানো তার একদম পছন্দ হত না। বাবার সেই মনকষ্টের কথা ভেবেই বোধহয় সে ঘরবাড়ী ছেড়ে একদিন ডোগর আর খড়িয়ালের জৈমলের সঙ্গে মিলে লুঠতরাজ করতে শুরু করে।

কিষন আর তার সঙ্গীরা যেদিন গাঁয়েরই বেনের বরযাত্রীদের ওপর লুটপাট করল সেদিন তার খুবই লজ্জা আর দুঃখ হয়েছিল। গাঁয়ের লোকেরা তাকে পাঁচজনের সামনে ডেকে বলেছিল, তার ছেলের এ কাজটা মোটেই ভাল হয়নি। গ্রামের লোকেরা যখন ঠিক করল যে বাসদেব সর্দার খবরটা থানায় দিয়ে আসবে তখন তাকেও মত দিতে হল বৈকি। ঘটনাটা শুনে থানাদার মৌড়গ্রামে পুলিশের একটা চৌকি বসাল।

কিষান সেকথা জানতে পেরে সঙ্গীদের নিয়ে গ্রামে আসে। সে বাজারে দাঁড়িয়ে বাসদেবকে প্রথমে যথেষ্ট গালাগাল দিয়ে তাকে গুলি করে। পুলিশ চৌকির সেপাইরা ভয়ে চৌকি ছেড়ে পালাতে কিষন আর তার সঙ্গীরা সকলে মিলে বাসদেবকে খুন করে।

সরকারী জুলুম শুরু হয়ে যায়। পুলিশ তার বাবা আর ভাই জীউণাকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের প্রচণ্ড মারধোর করে। কিষনের মাথার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। তার ঘরে পুলিশ তালা লাগিয়ে যায়।

কিষন গিয়ে ধরে জৈমলকে—'তুই আমার ভায়ের মত, আমাকে একটু সাহায্য কর। পুলিশকে ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ কর, আমার পেছনে লেগে থাকাটা খতম

করা।' কিন্তু জৈমল জবাব দেয়, 'আমার কাছে এখন কিছুই নেই।' কিষন বলে, 'সে কিরে! আমরা এত জায়গায় ডাকাতি করলাম, কত বরযাত্রীর দল লুঠ করেছি, মেলায় কত মেয়ের গয়না জোর করে খুলিয়েছি! সুনামের জৈনদের বাড়ী থেকে কত মাল এনেছিলাম, ঘড়ামের সুদখোরের বাড়ী থেকে কত নগদ টাকা পেয়েছিলাম! সে সব থেকে আমি আমার নিজের ভাগ এখনো তো নিইনি!'

জৈমল জানায়, 'আমার কাছে যা কিছু ছিল সব শেষ হয়ে গেছে।' কিষন নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে আসে। কিন্তু ব্যাপারটা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না।

জৈমলের স্ত্রী তার স্বামীকে বোঝায় যে কারুর গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করা ভাল নয়। বিপদের সময়ে লোকে বন্ধুত্বের খাতিরে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়, আর সে কিনা লোভে পড়ে এমন অন্যায় কাজ করল! বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকদের স্বর্গ-নরক কোন লোকেই স্থান হবে না। সে যথেষ্ট অনুরোধ মিনতি করে। এও বলে যে, কিষনের যদি মন্দ কিছু একটা হয় সে তাকে ছেড়ে কথা বলবে না।

কিন্তু জৈমল সে সবে কান দেয় না। বলে, 'বাজে বকবক করিস না, আমি অমন চুনোপুঁটি অনেক দেখেছি।''

কিছুদিন বাদে কিষন একদিন জৈমলকে এসে বলে, একটা বরযাত্রীর দল লুঠ করতে তার সঙ্গে যেতে হবে। জৈমল লোভে পড়ে যায়। গ্রামের বাইরে এসে কিষন তাকে বলে, 'তুই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস, কিন্তু আমি তোকে ধোঁকা দিয়ে মারতে চাই না—সামনা সামনি এসে লড়ে যা। আমি তোকে আজ শেষ করে দেবো।'' জৈমল বন্দুক চালায়, কিশন নিজেকে বাঁচিয়ে নেয়। তারপর কিষনের দান, সে এমন তাক করে গুলি চালাল—জৈমলের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে গুলি বেরিয়ে গেল।

জৈমলকে খুন করার পর কিষন তার বাড়ী গিয়ে তার বউকে জানাল যে, সে জৈমলকে হত্যা করেছে।

ডোগর সে কথা শোনার পর বলতে থাকে, 'ব্যাপারটা খুবই অন্যায়। কাউকে একবার বন্ধু হিসেবে মেনে নেবার পর তার দোষ দেখা পাপ। কিষনকে আর বিশ্বাস করা চলে না।'

চরের হাতে খবর পাঠিয়ে কিষনকে সে তাদের ডেরায় ডেকে পাঠায়, জানায়, তার বাঁচার একটা কোন রাস্তা খুঁজে বার করবে তারা। কিষন আসতে সে খুব খাতির যত্ন করে। মাংস আর মদের ঢালাও ব্যবস্থা করে। প্রাণভরে মদ খেয়ে শুয়ে পড়তেই বাইরে থেকে তালা দিয়ে ডোগর সদর থানায় গিয়ে খবর দেয়। প্রচুর পুলিশ এসে চারধার থেকে বাড়ী ঘিরে ফেলে। শেষ পর্যন্ত কিষন ধরা পড়ে যায়। বিলেতে রাণীর কাছে টেলীগ্রাম গেল, ডাকু কিষনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদেশ এল, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে দীপান্তরে পাঠাতে।



সেই কিষন আজ তার ভাই জীউণা মৌড়কে খবর পাঠিয়েছিল। জীউণার মনে গোড়া থেকেই সন্দেহ ছিল, কিন্তু আজ সে সন্দেহ দূর হল। সে পাকা খবর পেল যে, ডোগর বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে কিষনকে ধরিয়ে দিয়েছে। সেই রাতেই ঘুমন্ত বাপকে না জানিয়ে গাঁয়ের মাটিকে প্রণাম করে কুড়ুল কাঁধে জীউণা বাড়ী থেকে বিদায় নিল।

সকাল নাগাদ সে জঙ্গলে এসে পোঁছয়। সামনেই এক গোরা সাহেব শিকার করছিল। বন্দুক এক পাশে নামিয়ে রেখে সে জল খেতে যাবে, জীউণা হঠাৎ লাফিয়ে এসে বন্দুকটা উঠিয়ে সাহেবকেই নিশানা করে। সাহেব জোড় হাতে কাকুতি মিনতি করতে শুরু করে। ভয়ে সে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। জীউণার দয়া হল। সে বলে--'পালা বেটা বাঁদর এখান থেকে!' সাহেব ঘোড়ার পিঠে চেপে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে হাওয়া।

কিছুদূর যাবার পরই ডাকাতদের সঙ্গে জিউণার দেখা হল। ডাকাতরা তাকে একেবারে মাথায় তুলে নেয়। প্রথমত সে কিষনের ভাই। দ্বিতীয়ত, তার কাছে অমন চমৎকার একটা বন্দুক এবং তৃতীয়ত, সে স্বাস্থ্যবান তরুণ যুবক।

জীউণা কেবল একটাই শর্ত রাখে। তার গাঁয়ের প্রতি কেউ কুনজর দেবে না এবং তার গাঁয়ের মা-বোন মানেই অন্য সকলেরও মা-বোন। ডাকাতদের সঙ্গে মিলে সে অন্য চারটে জেলায় একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে দেয়। বহু জায়গায় ডাকাতি করে, বড়লোকদের লুটপাট করে, বরযাত্রীর দলকে আটকে রাখে, স্যাকরাদের একেবারে নিঃস্ব করে ছাড়ে। নানান জায়গা থেকে পুলিশের কাছে জীউণা মৌড়ের ডাকাতির খবর এসে পোঁছতে থাকে। পুলিশ তার সন্ধানে ঘোরে, কিন্তু তাকে কিছুতেই ধরতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তার মাথার ওপরেও পুরস্কার ঘোষণা করে। সবাই তার নামে থরহরি কম্পমান। কেবল তার নিজের গাঁয়ে লোকেরা বলে—"তুই আমাদের গাঁয়ের বাহাদুর ছেলে বটে। তুই তোর খুশিমত গাঁয়ে যাওয়া-আসা করতে পারিস। পুলিশ এসে পোঁছলে যেখানে ইচ্ছে একটু সরে গেলেই হল।'

লুঠের মাল সে কড়িয়ালের বেনে কাশীরামকে দিয়ে আসতো। টাকার লোভে তার মনে বিশ্বাসঘাতকতার ভাব জাগে। পুলিশকে সে আগাম জানিয়ে আসে যে ওমুকদিন ওমুক সময়ে জীউণা মৌড় তার কাছে আসবে। পুলিশ তার আগেই এসে উপস্থিত হয়। জীউণাও সে দিকেই আসছিল কিন্তু এক বুড়ি ছুটতে ছুটতে গিয়ে গাঁয়ের বাইরে তাকে খবর দিল, "ও জীউণাবাবা, তুই কাকে বিশ্বাস করেছিস? বেনের জাত একটা আধুলির জন্যে প্রাণ দিয়ে দেয়। সামনে পুলিশ এসে বসে আছে।' জীউণা সে সময়ে চলে যায় বটে কিন্তু পুলিশ ফিরে যাবার পর কাশীরামকে এসে উত্তম-মধ্যম লাগায়। কাশীরাম হাতে পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করে সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে যায়।

একদিন জীউণা লোঙ্গোবাল নামে একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল। গাঁয়ের কাছেই তীজের মেলা বসেছিল। সে গিয়ে সকলকে ধমক লাগাল। মাটিতে চাদর বিছিয়ে দিয়ে সে মেয়েদের হুকুম দেয়, 'সকলে এক এক করে গয়নাপত্র সব খুলে চাদরে রেখে যায় যেন।' জোর জবরদস্তির কাছে তো কেউ কোন কথা বলতে পারে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভয়ে তারা গয়না খুলে চাদরে রাখতে থাকে। কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। একজন কেবল বলে—'ভাই, আমার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা বড় ঝগড়ুটে, তারা বলবে, যা বাপের বাড়ী থেকে আবার গয়না গড়িয়ে নিয়ে আয়। আমার বাবা বিয়ের সময়ে জমি বাঁধা রেখে কোন রকমে কাজ সেরেছিল। আর ভাই, আমি তো তোমার বোনের মতই।'

সে কথা শুনে জীউণার মনে কে জানে কি হল, সে সব মেয়ে বৌদের বলে, 'যাও, তোমরা যে যার গয়না ফেরৎ নিয়ে যাও।' খালি চাদর ঝেড়ে পরিষ্কার করে তুলে নিয়ে সে সেখান থেকে রওনা দেয়।

পরের গাঁ দিয়ে যাবার সময় তার হঠাৎ খেয়াল হল, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। এদিক ওদিক তাকাতে দেখতে পেল, এক তরুণী ক্ষেতের দিকে খাবার নিয়ে যাচ্ছে। সে কাছে গিয়ে বলে, 'বোন রুটি খাওয়াবে?'

'এসো, ভাই' বলে মেয়েটি মাথা থেকে ঘোলের ঘটি নামায়। কাপড়ে জড়ানো রুটি খোলে, পিঁয়াজ ছাড়ায় এবং পাতায় করে আচার দেয়। গাছের ছায়ায় বসিয়ে মেয়েটি জীউণাকে রুটি খাওয়াল।

খাবার শেষে জীউণা মোড় 'বেঁচে থাকো বোন' বলে মেয়েটিকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে তাকে নগদ পঁচিশ টাকা দেয়।

কিছুদিন বাদে দোলেঅাল গাঁয়ে সে একজনের একটা খুব ভাল জাতের ঘোড়া উঠিয়ে আনতে যায়। ঘোড়াটা হঠাৎ হেঁচকা টান মারতে খোঁটাটা উবরে এসে জীউণার নাকে গিয়ে লাগে। সে বেশ রীতিমত জখম হয়। আর সেই থেকে তার নাকে একটা চিহ্ন থেকে যায়।

সেই ঘোড়ায় চেপে সে ডোগরের গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হল। ক্ষেতের এক মজুরের হাত দিয়ে খবর পাঠাল, 'যদি বাপের বেটা হোস তো সামনে আয়। মিথ্যে ধোঁকা দিয়ে আমার ভাইকে ধরিয়ে দিয়েছিলিস, এখন আমার হাত থেকে বেঁচে পালাবে কোথায়?'

একথা শুনে ডোগরের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সে বন্দুকে গুলি ভরে। কার্তুজের বেল্ট কাঁধে ঝুলিয়ে ঘোড়ার জিন কষে। মুখে বলে, 'জীউণার মৃত্যুই তাকে এতদূর টেনে এনেছে।'

যাবার সময় ডোগরার বৌ তাকে বাধা দিয়ে বলে, 'আজ তুমি যেয়ো না, রাত্রিরে আমি খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলাম—গাঁয়ে আগুন লেগেছে আর তুমি সেই আগুনে জ্বলে গেছো। কেউ যেন আমার কামিজ থেকে সোনার চেন খুলে নিয়েছে।'

কিন্তু ডোগরা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, 'তুই কিছু চিন্তা করিস না। শালা

জীউণা আমার কাছে কিছুই না। কিষনকে কালাপানী দেখিয়েছি, আর একে যদি জাহান্নমে না পাঠিয়েছি তো কি বলেছি।'

ঠিক যে সময়ে সে বাড়ী থেকে বেরোতে যাবে একটা কুকুর কান ঝটপট করল, একটু এগোতেই সে একটা মড়া দেখতে পেল। তার মাথাটাও কেমন টনটন করে ওঠে কিন্তু সে কোন খেয়াল করে না। সামান্য পথ যেতে না যেতেই এক পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা। বাঁদিকের ক্ষেতের থেকে ঘুঘুর ডাক শোনা যায়। আর একটু দূর যেতেই এক বিধবাকে নাক ঝাড়তে দেখে। লক্ষণ সবই অশুভ দেখা যাচ্ছে।

ডোগর ট্যাঁক থেকে মদের বোতল টেনে বার করে, তাতে তখনো আধ বোতল মদ ছিল। সবটা মদ গলায় ঢেলে খালি বোতলটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর গোঁফে ভাল করে তা দিয়ে সে মাঠে গিয়ে উপস্থিত হয়।

জীউণা বলে, 'ডোগরা, প্রকৃত বীর কাউকে ধোঁকা দিয়ে মারে না; তুই আগে দান নে।'

ডোগরা বন্দুক চালায়। জীউণার ঘোড়ার নীচে বসে যেতে গুলি তার মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। ডোগরা আবার আবার গুলি চালায়। জীউণা সেটা থেকেও নিজেকে বাঁচায় এবং পরক্ষণেই লক্ষ্যভেদ করে ডোগরকে ঘোড়া থেকে মাটিতে ফেলে দেয়।

ডোগরার বাড়ীতে কান্নার রোল ওঠে। ওধারে কে যেন মৌড় গ্রামে খবর পৌঁছে দেয় যে, জীউণা ডোগরাকে খুন করে কিষনের ওপর অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। লোকেরা বলাবলি করে 'ধন্যি ভাই বটে। ভাই হলে যেন এমনি ভাই হয়।'

বলাঢে থানা থেকে পুলিশ আসে জীউণাকে ধরতে। কিন্তু অত সহজে জীউণা ধরা পড়ার পাত্র নয়।

ডোগরাকে খুন করার পর জীউণা এক রাতে নিজের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল। গিয়ে বাপের পায়ে প্রণাম করে।

'কেন আমার এই পাকা চুলের সম্মান নষ্ট করছো? তোমারা না জন্মালেই তো এর থেকে ভাল করতে। আমি নিঃসন্তান হলেই ভাল ছিল। পুলিশের যখন তখন এসে গাঁয়ের সবাইকে ধমকাতে থাকে। মেয়ে-বৌদের বাড়ীর বাইরে বেরোনো মুশকিল হয়ে পড়ে।'

জীউণা বলে, 'বাবা, রাগ করছো কেন? আমি আমার কাজ শেষ করে এসেছি। যদি বলো তো কালই থানায় গিয়ে হাজির হতে পারি।'

'থানায়?...না...না। ওরা তোর রক্তের লোভে হন্যে হয়ে ঘুরছে। তোকে গুলি করে মেরে ফেলবে। সরকার তোর মাথার জন্যে পাঁচশো টাকা পুরস্কার রেখেছে। আমাদের গাঁয়ের লোকেরা সব ভাল তাই, নইলে নির্ঘাত এতদিনে কেউ পুলিশে খবর দিয়ে আসতো। তুই ভোর হবার আগেই এখান থেকে চলে যা। আমি এক্ষুনি তোর খাবার নিয়ে আসছি। এই বংশের সুনাম তো এখন তোর ওপরেই নির্ভর। আমি তো আজ আছি কাল নেই।'

এর কয়েকদিন পরেই জীউণা আর তার সঙ্গীরা এক বরযাত্রী দলের ওপর হামলা করে। বউয়ের গহনাপত্র সব খুলে নেয় তারা। বরযাত্রীদেরও সকলের টাকা পয়সা সব আদায় করে নেয়। নাকের কাটা দাগ দেখে ছেলের বাপ জীউণা মৌড়কে চিনতে পেরে যায়, সেও জাতে জাঠ। হাত জোড় করে সে তার কাছে মিনতি জানায়, 'জমি বন্ধক রেখে ছেলের বিয়ে দিচ্ছি। চেয়ে চিন্তে বউকে এইসব গয়নাপত্র পরিয়েছিলাম। ভগবানের দোহাই, তুমি আমার জাত ভাই। লুঠতে হয় তো সুদখোরদের লুঠ করো, তারা তো সব লুটে পুটে শেষ করছে সকলকে।' সে কথা শুনে জীউণা মৌড় গয়নাপত্র সব কিছুই ফেরৎ দিয়ে দেয় এবং নিজের কাছ থেকে এক হাজার টাকা তাদের দিয়ে 'সৎ শ্রী অকাল' বলে বিদায় নেয়। কৃতজ্ঞ জাঠ-ভাই বলে, 'আমার ভাই জীউণা মৌড় যেন যুগ যুগ বেঁচে থাকে।'

জীউণা মৌড়ের একদিন কি খেয়াল হল কে জানে সে নাভার রাজা হীরা সিংয়ের প্রাসাদে ঢুকে তার ঘোড়া বার করে নিয়ে আসে। বন্দুক উঁচিয়ে সিপাই সান্ত্রীদের ধমকে রেখেছিল। চলে যাবার সময়ে বলে আসে, 'মহারাজকে বলে দিস তোরা, জীউণা মৌড় তাঁর ঘোড়া নিয়ে গেছে।'

লোকেরা আশ্চর্য হয়ে ভাবে, জীউণা মৌড় রাজার ঘোড়া নিয়ে পালালো কি ভাবে? রাজা তার পেছনে প্রচুর পুলিশ লাগালেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশ একদিন ঘুমন্ত জীউণাকে ঘেরাও করে :

হস্‌স কে জীউণা আখদা ঘোড়ী বড়ী কমাল,
বক্কী সাঁভ লয়ো আপদী মৈঁ দেখী সী বাল।[1]

পরের দিন মহারাজা তার সঙ্গে জেলে দেখা করতে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছে সে? সে বলে কয়েদীদের জন্য লোহার খাঁচা বানাতে, এ ধরণের জেল থেকে তো তারা সব পালিয়ে যেতে পারে। মহারাজ হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—'ঠিক আছে, তুমি পালিয়ে গিয়ে দেখাও।' কারণ রাজা ভেবেছিলেন, এমন কড়া পাহাড়ার ব্যবস্থা, লোহার গরাদ দেওয়া দরজা এবং জেলের এই উঁচু পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে কেউ পালাতে পারবে না।

সেই রাতেই জীউণা মৌড় জেল থেকে পালাল।

সে সময়ে অনেকে আবার জীউণা মৌড়ের নাম নিয়ে ডাকাতি করতো। পুলিশ ভয়ে অকুস্থলে তাড়াতাড়ি পৌঁছত না পর্যন্ত।

একদিন এক ব্রাহ্মণ তার মেয়েকে শ্বশুর বাড়ীতে রাখতে যাচ্ছিলেন। জঙ্গলের পথে একদল লুটেরা তাদের ঘেরাও করে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের করুণ মিনতি তারা

1. জীউণা হেসে তাদের বলে, ঘোড়াটা সত্যিই খুব চমৎকার, তোমাদের ঘোড়া তোমরা নিয়ে যাও, আমি তো কেবল ঘোড়াটা কেমন ছুটতে পারে সেটা দেখছিলাম।

শুনছে না দেখে মেয়েটি ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। দৈবক্রমে সেখান দিয়ে জীউণা মৌড় স্বয়ং যাচ্ছিল। সে গিয়ে সেই লুটেরার দলকে পাকড়াও করে।

'তুই আমাদের মধ্যে নাক গলাতে এসেছিস কে রে?' —একজন বলে।

'আমি জীউণা মৌড়, তোর বাপ রে!' —সে গর্জে ওঠে।

লুটেরা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে তার পা জড়িয়ে ধরে। তাকে আচ্ছা করে জুতো পেটা করে ছেড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ আর তার মেয়েকে সে নিজে তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে আসে। ব্রাহ্মণ তাকে বারবার আশীর্বাদ করলেন এবং সকলের কাছে তাকে নিরুপায় গরীবদের রক্ষক এবং দেবদ্বিজে ভক্তিমান বলে গুণগান করতে শুরু করেন।

সমসাময়িক কবিরা তাকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছিল:

জীউণা মৌড় সাধ গঊ গরীব দী করে সেবা
খব্বী খানাঁ দী অলখ মুকা উঁদা জী।
জেড়ে বাদশাহ্ দে ঘর করে চোরী
পর্চা ছাপ কে পহলাঁ লগবদা জী।
শীহনী মাঁ নে জম্মেয়া শের জীউণা,
নহীঁ লুক্ক কে বকত লঙ্ঘাবদা জী।[1]

□

জীউণা মৌড়ের হঠাৎ একদিন ইচ্ছা হল, বিপদে আপদে যে দেবী তাকে সর্বদা রক্ষা করছেন তাঁকে একবার দর্শন করতে যাবে। সব রাজাদের সে খবর পাঠাল—নয়নাদেবীর মন্দিরে যাবো আমি। যাঁর কৃপায় বাদশার সৈন্যদের আমি নাক কান মুলেছি তাঁর মাথায় সোনার ছত্র ভেট দিয়ে আসবো।

পাতিয়ালা শহরে পৌঁছে সে পুলিশের পোষাক পরে হাবিলদার সেজে দুর্গের দেওয়ালে ইস্তাহার লাগিয়ে আসে যে জীউণা মৌড় আদালত বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদি কেউ ধরতে পারো তো ধর তাকে। সন্ধ্যা সাতটার সময় সে ষ্টেশন থেকে নয়নাদেবীর মন্দিরে যাবার জন্যে গাড়ীতে উঠবে।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে আনাচে কানাচে পুলিশের পাহারা বসে। সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবুও জীউণা মৌড় সকলের চোখে ধূলো দিয়ে সাধুর বেশে নয়নাদেবীর মন্দিরে যাবার গাড়ীতে চড়ে বসে। পুলিশেরা সঙ্গে সঙ্গে যায় তার। সমস্ত কামরা তল্লাসী করেও তারা জীউণা মৌড়ের কোন সন্ধান পায় না।

জীউণা মৌড় গাড়ী থেকে নেমে প্রথমে আনন্দ সাহেবের গুরুদ্বারে দশম গুরুর

1. জীউণা মৌড় সাধু, গোমাতা আর গরীবদের সেবা করে, বদমাশ আর অত্যাচারীদের অহঙ্কার খর্ব করে। সম্রাটের প্রাসাদে চুরি করার আগে তাকে আগাম খবর পাঠায়। সিংহিনী-মা জীউণা-সিংহকে জন্ম দিয়েছে, সে চোরের মত লুকিয়ে জীবন কাটায় না।

সেবার জন্য সওয়াশ' টাকার ভেট চড়ায়। দশমগুরু হিন্দুস্থানে নিজের চার ছেলেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

এবার সে নয়নাদেবীর মন্দিরে যায়। পুলিশ মন্দিরটাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। সে দেবীর মন্দিরে সোনার ছত্র দান করে। দেবীর চরণে প্রণাম করে। দেবী তাকে দর্শন দিয়েছিলেন। জীউণা মৌড়ের সেই মুহূর্তে মনে হল তার জীবন-মরণের সব সংশয় যেন দূর হয়ে গেছে।

পুলিশ চারিধার থেকে তাকে ঘিরে ধরে। নাকের সেই কাটা দাগের জন্যে জীউণাকে তারা সনাক্ত করে। ধরতে যাবার সময় জীউণা-সাধু চিমটে নিয়ে আক্রমণ করে। পাঁচ সাতজন পুলিশকে মেরে ভাগায়। পুলিশ গুলি চালাতে সুরু করে। জীউণার কাছে সে সময়ে বন্দুক ছিল না।

শেষ পর্যন্ত জীউণাকে তারা গ্রেপ্তার করে। দেবীকে আর একবার প্রণাম করে সে পুলিশের সঙ্গে রওনা দেয়।

কয়েক শ' পুলিশের কড়া পাহাড়ার মধ্যে তাকে প্রথমে ফিরোজপুর জেলে নিয়ে আসা হয়। বিলেতের রাণীর কাছে আবার টেলিগ্রাম গেল, কিষন ডাকাতের ভাই জীউণাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রাণীর কাছ থেকে ফাঁসীর হুকুম আসে।

আটদিন পরে ফাঁসীর দিন ধার্য করা হল। জেলের অফিসার তাকে জানাল, যা মন চায় খেয়ে দেয়ে নিতে এবং যার সঙ্গে ইচ্ছা এই বেলা দেখা করে নিতে পারে সে।

সিংহপ্রাণ জীউণা জবাব দেয়—'কেবল খাওয়া দাওয়ার জন্য আমরা জগতে আসিনি। ভাই যে তার ভায়েরই দেহের একটা অংশ, পৃথিবী চিরকাল একথাটা স্মরণে রাখবে। আর লোকেদের সঙ্গে দেখা করার বিষয়ে আমার বক্তব্য হল যার মন ব্যাকুল হবে দেখা করার জন্য সে নিজের থেকেই দেখা করতে আসবে।'

গোবিন্দী নামে জীউণার এক বোন ছিল। সে বড়লাটের দরবারে পর্যন্ত মকদ্দমা চালাল কিন্তু লাভ কিছু হল না।

অষ্টম দিন এসে পৌঁছয়!

সবাইকে 'সৎ শ্রী আকাল' বলে অভিবাদন করে জীউণা ফাঁসীর মঞ্চে উঠে যায়।

বোন গোবিন্দী কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'হে বীর ভাই, তীজের উৎসবের দিন আমি কার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবো? কে আমাকে আর উপহার পাঠাবে?'

জীউণা মৌড় এভাবেই তার নাম পেছনে রেখে গেছে। যতদিন এই পৃথিবী থাকবে, লোকেরা তাকে স্মরণে রাখবে:

ভাবেঁ ঘর-ঘর পুত্ত জম্মদে
জীউণা মৌড় না কিসে বণ জাণা।

গুলজার সিং সন্ধু

কৈমা মলকী

'গড় মুগলানে দীয়াঁ নারাঁ পীঁছাঁ ঝূট দীয়া'[1] তীজ উৎসবের এই ছড়া গানে সবাই মেতে উঠেছে। গানের মেয়েরা অশথ গাছের ছায়ায় গানের তালে তালে দোলনায় মেয়েদের দোল দিতে থাকে। গড মুগলানের এই অশথ গাছের দোলনা সারা এলাকায় বিখ্যাত। কত বংশ পরম্পরা ধরে যে এই অশথ গাছের দোলনায় মেয়েরা দোল খেয়ে আসছে তা এখন আর কেউ বলতে পারে না। এর ডাল মজবুত আর পাতা সঘন ছায়াময়। জমিদারের মেয়ে মলকী গানের মূল গায়েন। সে যখন দোলনায় চাপে তখন এই বৃদ্ধ অশথ গাছের শেকড়কে পর্যন্ত নড়িয়ে দেয়।

মলকীর বাবা রায় মুবারক গাঁয়ের শুধু জমিদারই নয়, সে সারা অঞ্চলের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। তার তরুণ দুই ছেলে যৌবনের দীপ্ত স্বাস্থ্য আর শক্তিতে টগবগ করছে যেন। ছেলেদের নাম রাহুন আর মহরুন। তার ভাই দরিয়া দিল্লীতে বাদশার দরবারে সুবেদার। সরকারী দরবারে যোগাযোগ থাকার জন্যে তার বংশের নাম-ডাক অন্যের তুলনায় কিছু বেশি। রায় মুবারক, দরিয়া, রাহুন আর মহরুন একে অন্যের থেকে চার ছ'বছরের ছোট বড় সব। একসঙ্গে বসলে সকলকে সম্পর্কে ভাই-দাদা বলে মনে হয়। এই চারজনকে সকলে মনে মনে এলাকায় চারটে স্তম্ভ হিসেবে মানত। তারা লাঠি হাতে রুখে দাঁড়ালে হাওয়া পর্যন্ত গতি পালটাতে পথ পেত না।

বাবা-মার প্রতাপ-প্রতিপত্তির জন্য মলকী স্বভাবে সাহসী হয়েছিল। চতুর্দ্দশীর চাঁদের মত তার রূপ ও বুদ্ধির দীপ্তি। হীর কিংবা সস্সীর থেকে কোন অংশেই সে কিন্তু কম ছিল না—গাঁয়ের গৌরব আর সারা এলাকার গর্ব ছিল সে। পূর্ণ যৌবনা যুবতী বলে তারুণ্যের অহঙ্কার ও গর্বের সঙ্গে সে যতটা পরিচিত ছিল, সেই বয়সের দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে তার তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। যৌবনের দোলনার দড়ি যে কোনদিন ছিঁড়ে যেতে পারে একথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না। এমন কি যে ডালে সে দোলনা ঝুলিয়েছিল, সে ডালও কোনদিন ভেঙ্গে পড়তে পারে তা ছিল তার চিন্তার অগোচর।

---

1. গড় মুগলানের মেয়েরা দোলনায় দুলছে এখন।

মলকীর এই উদ্ভিন্ন যৌবন তার মা গোন্দলার কাছে কাঁটার মত খচখচ করে। ঘরে যুবতী মেয়ে থাকলে কোন মা-ই বা সুখে ঘুমোতে পারে? কত সামান্য ব্যাপারেও পরিবারের মান সম্মান মাটিতে মিশিয়ে যেতে পারে। যতদিন না মেয়েকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে তাকে তার নিজের সংসারে না পাঠাতে পারে, ততদিন মায়ের প্রাণে শান্তি নেই। বাপ একেবারে অন্য ধাতের, এসব ব্যাপারে সে কোন গা করে না। মেয়েকে তার এখনো সেই ছোটটি বলেই মনে হয়। গোন্দলার কেন যে এত মাথা ব্যথা, এত চিন্তা তা সে ভেবে পায় না। মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে এই তো। সে ভাবে, যৌবন তো সকলের একদিন আসবেই।

শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে বাপ একদিন ছোট ভাই দরিয়াকে চিঠি লিখে দেয়। মলকী যেমন রায় মুবারকের মেয়ে, তারও তো তেমনি। বাড়ীর মেয়ের মান সম্মানের দায় দায়িত্ব সকলের ওপরে। দরিয়া সরকারী মহলে যোগ্য বরের সন্ধান করতে পারবে। এতে আর কোন লাভ হোক বা না হোক মলকীর মা তার বাপের বাড়ীর লোকেদের মুখ বন্ধ করতে পেরেছিল।

গোন্দলা কিন্তু নিজের মনে খুশি এবং দুঃখ দুই হতে থাকে। খুশি এই কারণে যে তার মেয়ের বিয়ের জন্যে চেষ্টা শুরু হয়েছে আর দুঃখের কারণ হল যে দরিয়া যদি সত্যি সত্যিই কোন উপযুক্ত পাত্র খুঁজে আনে তাহলে সে তার নিজের দেওয়া কথা রাখতে পারবে না। আসলে ব্যাপারটা হল, গোন্দলার এক দূর সম্পর্কের বোন লালীর তখ্‌ত হাজারার সর্দারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। লালো বড় ছেলের জন্মের সময়ে আঁতুর সামলাতে তখ্‌তহারা গিয়েছিল। বোনের ছেলে জন্মেছিল সূর্যের মত চোখ ধাঁধানো রূপ নিয়ে। কৈমা নামে এই ছেলেটি গোন্দলার কাছে তার নিজের ছেলেদের থেকে বেশি প্রিয় ছিল। সে শান্ত স্বভাবের ছেলে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কম করত। গোন্দলা তার নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিল, কৈমা বড় হলে খুবই শান্ত-শিষ্ট হবে। সবসময়েই মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে থাকা পুরুষের সংসারে থেকে থেকে সে তিতিবিরক্তি হয়ে উঠেছিল। সে বোনকে কথা দিয়েছিল যে যদি ভগবানের দয়া হয়, তাহলে তখ্‌তহাজারা আর গডমুগলের মধ্যে বংশপরম্পরার সম্বন্ধ গড়ে উঠবে। ভগবানের দয়ার মানে হল, যদি আবার তার কোলে কোন সন্তান আসে। দুই ছেলের জন্মের পর একটা মেয়ের জন্যে সে পীরের দরগায় মানত করেছিল। পীর কোনদিন কাউকে নিরাশ করে না। সে তাই লালোকে একরকম কথাই দিয়ে এসেছিল যদি তার কোনদিন মেয়ে হয় তাহলে তার বিয়ে সে কৈমার সঙ্গে দেবে। কৈমার বাবা বা গোন্দলার স্বামীর এতে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।

আপত্তির কোন কারণ না থাকলেও গোন্দলা তার স্বামীর বাঁকা স্বভাবের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। তাকে যে রাস্তায় চলতে বলবে সে ঠিক তার বিপরীত রাস্তা দিয়ে যাবে। এই উল্টোপথে চলতে সে যে কি আনন্দ পায় কে জানে। সে কারণেই সে কথাটা এতদিন নিজের মনের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। সুযোগ মত বলবে ভেবে। দরীয়ার কাছ থেকে গোন্দলা 'কিছু হল না' সংবাদ শোনার আশায়

অপেক্ষা করে থাকে। দরীয়া 'হল না' বললে সে তারপরে নিজের প্রস্তাবে স্বামীকে সহজে রাজী করাতে পারবে।

কিন্তু চিঠি পাওয়া মাত্রই দরীয়া তড়িঘড়ি মুগলানে এসে উপস্থিত হল। মালকীর জন্যে বরের কি কোন অভাব আছে নাকি? দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তাকে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখা গেল। দরীয়া এসে পৌঁছতে বাড়ীর ছেলেরা খুশি হলেও মেয়েরা দুর্ভাবনায় পড়ে। কে জানে এবার কি হবে! খাবার ব্যবস্থা করতে করতেও গোন্দলা ছেলেদের আলোচনার দিকে কান খাড়া করে থাকে আর মলকীও বসে থাকে দেয়ালে কান লাগিয়ে।

ঠিক বোঝা গেল না, রায় মোবরককে দরীয়া কি বলল, কিন্তু ঘরের সবাই একদম বেবাক চুপ। যেন ঘরে হঠাৎ সাপ ঢুকে সবাইকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে। ঘরের থমথমে আবহাওয়া থেকে অবশ্য বুঝতে পারা গেল যে দরীয়ার প্রস্তাবে অন্য কারুর মত নেই। গোন্দলা বা মলকী কারুর সেটা অজানা থাকে না। প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা যে ঠিক কি সেটা দরীয়া ছাড়া ছেলেরা আর কেউ বুঝতে পারে না। দরীয়ার মতিগতি এমন কি করে হল ভেবে ছেলেরা মনে দুঃখ পায়, 'ঠিক আছে, ভেবে দেখবো' বলে জমিদার কথাবার্তার প্রসঙ্গ পাল্টায়। তারা চাষ আবাদের কথা আলোচনা করতে করতে এক সময়ে শুয়ে পড়ে।

শুয়ে পড়লেও কারুর চোখে ঘুম আসে না। দরীয়ার দুঃখ হচ্ছিল যে তার দাদা তার প্রস্তাবে রাজী হোল না। আর তার দাদার মনে কষ্ট হচ্ছিল এই ভেবে যে, এ কি আশ্চর্য প্রস্তাবে দরীয়া তাকে রাজী করাতে এসেছে। ভাইপোরাও তাদের বাবার সঙ্গে একমত।

ওধারে গোন্দলা আর মলকী বারান্দায় শুয়ে একে অন্যের হৃদস্পন্দন শুনতে থাকে কেবল। দরীয়ার প্রস্তাব যে মানা হয়নি একথা মা মেয়ে দুজনে পরিষ্কার জানতে পারলেও তখনো কিছুতেই বুঝতে পারছিল না প্রস্তাবটা কি ছিল, এবং সেটা স্বীকার না করার পর কি-ই বা ঘটতে পারে।

গোন্দলার মনে হল, যা হয়েছে তা একপক্ষে তার দিক থেকে ভালই হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত পুরোপুরি ব্যাপারটা জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ তার খামখেয়ালী স্বামী আর তার থেকেও বেশি মেজাজী মেয়ের ওপর কোন ভরসা করাও যাচ্ছে না। গোন্দলা মলকীর মনে কৈমীর যে ছবিটা এতদিন ধরে ফুটিয়ে তুলেছিল, সেটা হঠাৎ এখন মুছে ফেলা মলকী সহ্য করবে না। মেয়েদের হৈ হুল্লোরে ভাই-পছন্দ হলেও, স্বামী শান্তশিষ্ট স্বভাবের হওয়া দরকার। মলকী ভাবে, সে কৈমীর কাছে শান্তিতে নিশ্চিন্ত হয়ে সংসার করতে পারবে—প্রেমের ঝুলনে নির্ভাবনায় ঝুলতে পারবে।

কৈমী সম্পর্কে রাঞ্ঝার ভাইপো। রাঞ্ঝার কাহিনী সবেমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনার মত তাজা রয়েছে সকলের মানসপটে। রাঞ্ঝার ভাইপো বলে কৈমীর নামের সঙ্গেও প্রেমের ইতিহাস যেন যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। মলকীর তরুণী মনে কৈমীর সেই ঐতিহাসিক প্রেমিক প্রতিবিম্বটি যেন গেঁথে গিয়েছিল। যেন তার মাথায় কেউ

জাদুদণ্ড ছুঁইয়ে দিয়েছিল। সেই মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গল যেখানে রাঞ্ঝা একদিন বড় হয়ে উঠেছিল তা সে স্বপ্নে দেখতে পেত। কৈমা রাঞ্ঝার মত রূপবান না হলেও তার থেকে খুব একটা কমও কিছু হবে না। মা-ও বলেছিল সে খুব শান্ত স্বভাবের এবং খাঁটি কথার মানুষ।

গোন্দলা তখ্‌ত হাজারার সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে তোলায় অনেক লাভ দেখতে পায়। লালো তার বোন, তার শরীরেরই একটা অঙ্গ বলতে গেলে। মলকী যেমন তার নিজের মেয়ে লালোরও তেমনি। কৈমা যেমন লালোর ছেলে তেমনি তারও কিছু কম নয়। রক্ত চিরকাল রক্তই থাকে—আর জল, জলই। কিন্তু দরীয়া রক্তকে জল আর জলকে রক্ত করে তোলার খেলায় মেতেছিল। সকাল হতেই পরিবারের সকলে সে কথা জানতে পারে। শোনা গেল, দরীয়া তার ভাইঝিকে সম্রাট আকবরের ঘরনী করতে চেয়েছিল। বুড়ো বাদশা মলকীর রূপ যৌবনে খুশি হয়ে দরীয়াকে দরবারে আরো বেশি সম্মান আর মর্যাদা দিতে পারত। রাজপুত হোক আর যেই হোক নিজের আত্মীয়-স্বজনকে তিনি অসুবিধের মধ্যে তো আর রাখতে পারেন না। দরীয়া সুবেদার থেকে সেনাপতি হতে পারতো। সে আকবরের খুড়শ্বশুর হতে চলেছিল। নিজের শ্বশুরকে কেউ কখনো নিজের থেকে ছোট মর্যাদায় রাখে না। দরীয়া সেনাপতি হবার স্বপ্ন দেখছিল। আকবরের নিজের হয়তো এসব চিন্তা মাথায় আসেনি, কিন্তু দরীয়া সম্রাটের দুর্বলতার খবর রাখে। ভাইকে কেবল রাজী করাতে পারলেই দরীয়ার কাছে রাজদরবারের সব দরজা খুলে যাবে। এইতো সেদিনের কথা, সেলিমের প্রেমিকা আনারকলি তাঁর আদেশ মানেনি বলে আকবর তাকে শেষ করে দিলেন। দরীয়ার পুরোপুরি বিশ্বাস, তার ভাইঝি আনারকলির থেকে কোন অংশে কিছু কম নয়।

মুগলান পরিবারের সকলেই দরীয়ার মনের কথাটা বুঝতে পারে। সকাল হতে না হতেই সারা বাড়ীর আনাচে কানাচে সেই বিষ ছড়িয়ে পড়ে। ভোরবেলা মা-মেয়েকে সেই বিষ হুল ফোটাতে তারাও বিষ ঝড়াতে শুরু করে। গোন্দলা নিজের হাতে দরিয়াকে মানুষ করেছে। সে তার নিজের ভাইঝিকে এ কোন পথে নামাতে চাইছে? কাল পর্যন্ত যে বৌদির কাছে খাবার চেয়ে খেত সে আজ রাজদরবারে তার নিজের উন্নতির জন্য এ কি চতুর চাল চালতে চলেছে।

পরের দিন সকালবেলা দরীয়া দিল্লী ফিরে যাবার সময় কেউ তার সঙ্গে ভাল করে কথাও বলে না পর্যন্ত। রায় মুবারক তার নিজের বংশের থেকে উঁচু ঘরে সম্বন্ধ করার পক্ষপাতি নয়। উঁচু ঘরের লোকেরা মেয়ের ওপরে তাদের ধনদৌলতের গরম দেখাবে; তাছাড়া তাদের নিজেদের মত মোটামুটি স্বচ্ছল জমিদারের তো কোন অভাব নেই! আর তাদের একমাত্র মেয়েকে খুব দূরেই বা তারা পাঠায় কি করে! পাঁচশো ক্রোশ দূরে মেয়েকে যদি বিয়ের জন্যে পাঠাতে হয় তাহলে তো সে মেয়ের বেঁচে থাকা বা মারা যাওয়াতে কোনই তফাৎ-ই থাকে না! ছেলে মেয়েরা যদি বিপদে আপদে সুখ দুঃখের ভাগীদার না হল তো তাদের থেকেই বা লাভ কি?

সংসারে ভাঙ্গন ধরল। মলকীর চঞ্চল মন ভাবনায় ডুবে যায়। জমিদার ভাই লড়াই করতে নামলে কারুর মাথা না নিয়ে স্থির হত না। ভাইয়ে ভাইয়ে শক্রতার মত খারাপ আর কিছু নেই। দুজনেই দুজনের গোপন রহস্য জানে। ঘরের শক্রতার জন্যই লঙ্কা ধ্বংস হয়েছিল।

মলকীর আজকাল দোলনায় দুলতে গেলে দোলনার কাঠেতে পা দিতেও তার ইচ্ছে করে না। কোনমতে মন মানিয়ে দোলনায় চড়লেও দু-একবার দোল খাবার পরই হাঁফিয়ে পড়ে। পাশের দোলনায় তার সাথীরা সামান্য উঁচুতে দোলনা চড়ালেই তার মনে ভয় ধরত। একদিন যে মলকী গাছের শেকড় পর্যন্ত নড়িয়েছে সে আজ সামান্য পাতার কম্পনেই ভয় পেয়ে যায়। সরকারী রোষে তার বাবা-মার হাতে দড়ি পড়তে পারে। কৈমা তখ্‌ত হাজারাতে অপেক্ষায় বসে থাকে আর মলকী চিন্তা ভাবনায় পাগল হয়ে যায়। তাকে যেন সেই দোলনাওলা অশথগাছ আর চালাঘরটা গ্রাস করতে ছুটে আসতে থাকে। মনই যখন আনন্দে মাততে চাইছে না, তখন শুধু দেহটা নিয়ে সে আর কি ই বা করতে পারে।

গোন্দলা এই সুযোগে রায় মুবারককে মলকীর বিয়ের সম্বন্ধ কৈমের সাথে করবার প্রস্তাবটা পাড়ে। তখ্‌ত হাজারার দুলারা সমপর্যায়ের জমিদার। ভায়রা-ভাই কুটুম হবার যোগ্য দাবিদার। রায় মুবারকের শালী লালোও খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে। যাতায়াত খুব কম থাকা সত্ত্বেও তখ্‌ত হাজারার লোকেদের আচার ব্যবহার রায় মুবারকের মনে যথেষ্ট দাগ কেটেছিল। কখনো একসঙ্গে শিকারে গেলে তাদের মধ্যে মতের ও মনের মিল খায় বেশ। অল্প সময়ের মেলামেশাতেও মানুষকে যথেষ্ট চেনা যায়। এই সম্বন্ধের কথাটা রায় মুবারকের মাথাতেই আসেনি। মাথায় আসলে কি আর দরীয়ার ঐ উপকার নিতে যেতে হত নাকি? মেয়েও আনন্দে ঘর সংসার পেতে বসতো আর ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্কের ভাঙ্গন ধরত না। তার এখন নিজের ওপরেই রাগ ধরে যায়। কথাটা আগে কেন বাড়ীতে বলেনি ভেবে গোন্দলাও মনে মনে কিছুটা দুঃখ পায়। লালোকে যে সে অনেক আগেই এ বিয়ের কথা দিয়েছিল সেটা অবশ্য রায় মুবারকের ভয়ে সে এখনও চেপে যায়।

কৈমার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হতে বাড়ীর সকলেই খুব খুশি হল। একেবারে পাল্টি ঘর। অবিশ্বাসের তপ্ত আবহাওয়ার বদলে বিশ্বাসের শীতল বাতাস যেন বইতে থাকে বাড়ীতে।

মলকীর মনের পর্দায় কৈমার মূর্তি দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে থাকে। কৈমা যতই তার মন অধিকার করে নিতে থাকে মলকীর ততই সম্রাট আকবরের ওপর রাগ হতে থাকে। দরীয়ার প্রস্তাব হয়তো সম্পূর্ণভাবেই তার নিজের মনগড়া কিন্তু বুড়ো সম্রাটের সঙ্গে তার নাম মুহূর্তের জন্যেও হওয়াটা মলকীর পছন্দ হয় না। তার মনের বাদশার সঙ্গে আর কোন বাদশার যেন তুলনাই চলে না। দুটো ছবি যুগপৎ তার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়—প্রথমটি সৌন্দর্যের দেবতা কৈমার, আর অন্যটা বুড়ো বাদশা আকবরের।

কৈমার সাথে সম্বন্ধ পাকা হবার পর মলকীর রূপের খ্যাতি তখ্‌ত হাজারাতেও ছড়িয়ে পড়ে। গড় মুগলানের সুন্দরীকে লাভ করার বাসনা কৈমার মনে দিন দিন তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। কার সঙ্গে মলকীর বিয়ের সম্বন্ধ রায় মুবারক ভেঙ্গে বদলে তাদের সঙ্গে করেছে সে খবর কৈমা আর তার পরিবারের সকলেই জানতে পেরেছিল। সম্রাট আকবরের সঙ্গে তাকে সমতুল্য জ্ঞান করাতে কৈমা তার আনন্দ আর ধরে রাখতে পারে না। কিন্তু বিয়ের পাঠ যতক্ষণ না ভালয় ভালয় চুকে যাচ্ছে সে মনে শান্তি পায় না। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সে মলকীর বাবা-মার ইচ্ছা অনিচ্ছার দাস মাত্র। তাদের ইচ্ছার সঙ্গে দরীয়ার ইচ্ছা ভাবনার সংঘাত লাগছে বর্তমানে। দরীয়ার ইচ্ছা আবার যেমন তেমন মামুলি ইচ্ছা নয়—তার নেপথ্যে আকবরের বিচক্ষণতা আর সরকারী চাপ রয়েছে। কৈমার ইচ্ছা করছিল সে উড়ে গিয়ে মলকীর সঙ্গে দেখা করে আসে, কিন্তু সামাজিক নিয়মকানুনের কথা ভেবে সে সাহস পায় না। অবশ্য উড়ে যাওয়াও খুব সহজ ছিল না। দুটি গ্রামের মধ্যে দুই নদীর ব্যবধান। তখ্‌ত হাজারা বিতস্তা নদীর পারে আর গড় মুগলান সিন্ধু নদীর তীরে।

উভয় পক্ষের মা-বাবাই দরীয়ার ওপরে আর কোন বিশ্বাস রাখতে পারে না। তারা ব্যাপারটাকে বেশি ঝুলিয়ে রাখতে চায় না। দুলারা আর রায় মুবারকদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘন ঘন হতে থাকে এবং তারা এবার একসাথে শিকারে যাবার স্বপ্নও দেখতে শুরু করে। বিতস্তা থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটা এখন তাদের দুজনের হতে চলেছে। তারা নিজেদের খুশি মত যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে। দুই নদীর তীরের বাঘ সিংহ হরিণ তিতির মোরগ প্রভৃতি তাদের দুজনেরই এখন নিজের বলে মনে হতে থাকে। কল্পনায় তারা এখন তাদের শিকারী কুকুরকে জঙ্গলী হরিণের পেছনে তাড়া করে বেড়াতে দেখতে পায় যেন।

রায় মুবারক বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলে। 'আমার কথা যদি শোন তো বলি, এই ব্যাপারে দরীয়াকে না ডাকলেই ভাল হবে।'—গোন্দলা পরামর্শ দেয়।

'কি যে বলো তুমি! তাকি কখনো হয়? হাজার হলেও সে তো আমার আপন ভাই। দরীয়া দেখো কিছুই বলবে না। কিছুক্ষণের জন্যে তার মনে লোভ জন্মেছিল। এখন সে সব চুকে বুকে গেছে।'—রায় মুবারক বোঝায়।

'লোভী মানুষকে কোন বিশ্বাস নেই, কিন্তু তুমি যখন বলছো...' গোন্দলা বিষয়টা স্বামীর ওপরেই ছেড়ে দেয়। ছেলেরাও বাবার কথাতেই সায় দেয়। কাউকে অখুশি করা ঠিক নয়। তারা দরীয়াকে কিছুটা ভয়ও করতো। নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিয়ের আয়োজন চলতে থাকে। এধারে মলকীর বাড়ী চুণকাম করা হয়, ওধারে, কৈমার বাড়ী। এদিকে বরপণের ব্যবস্থা হতে থাকে, ওদিকে গায়ে হলুদের তত্ত্বের আয়োজন চলতে থাকে। এদিকে আস্তাবল সাজানো হল, ওদিকে ঘোড়াকে। এধারে মলকীর বুক ধুকপুক করতে থাকে, ওদিকে কৈমার।

বিয়ের দিন দরীয়া এসে পৌঁছায়। সে খচ্চরের পিঠে আঙুর রসে তৈরী মদ ভরে নিয়ে আসে। তার সঙ্গে বাদশাহী আতসবাজী আর বাদশাহী কার্পেটও ছিল। তার আচার আচরণে পুরণো ঘটনার কোন চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। মেয়ের দায়-দায়িত্ব পরিবারের সকলকেই বহন করতে হয়, সেক্ষেত্রে অন্যায় করলে অপরাধীকে নরকে বাস করতে হবে।

বিয়ের রাতে গড় মুগলানের জমিদার বাড়ীতে মদের পাত্রে তুফান ওঠে। বড়োরা সদরে মদের পাত্র নিয়ে বসে আর মেয়েরা নতুন জামাইয়ের ঘরে আসর জমিয়ে বসে। দোঁহা-শায়েরী চলতে থাকে। শাশুরী জামাইকে একটা গোটা লাড্ডু খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। শালীরা ঠাট্টা ইয়ার্কীতে মেতে ওঠে।

বিয়ের পাঠ একসময় চুকে যায়, কৈমা আর মলকী এখন দুজনের আপন। কারুর মনে আর কোন বিষয়ে আশঙ্কা থাকে না। দরীয়া আঙুরের মদ আনার জন্য দুপক্ষের কাছেই আসরের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিল। সে কেবল দিতে থাকে আর অন্যেরা আকণ্ঠ পান করতে থাকে। রায় মুবারকের বৈঠকখানায় বোতলের ছিপির পর ছিপি খোলা হতে থাকে আর ওপাশে বিয়ের আসরে নাচের তালও বাড়তে থাকে।

শালীদের হাত থেকে মুক্তি নিয়ে কৈমাও সদরে এসে এক এক করে বেশ কয়েক পাত্র মদ খেয়ে ফেলে। একে তো বিয়ের আগের উৎকণ্ঠা ছিল কিছুটা, তার ওপরে ছিল বিয়ের ঝামেলার ক্লান্তি। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে মলকীর রূপের যেটুকু আভাস দেখতে পেয়েছিল তার মাদকতাও কিছু কম নয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সে দলের অন্যদের সঙ্গে মিলে এক হয়ে যায়। অল্পক্ষণ বাদেই দেখা গেল বরযাত্রী দল আর বাড়ীর লোক দুপক্ষই কাত হয়ে পড়েছে। কেবল দরীয়ারই শুধু জ্ঞান ছিল। সে চালাকি করে মদ খায়নি আর খেলেও যত না খেয়েছে, তার থেকে বেশি ছলকে ফেলেছে এদিকে ওদিকে।

সুযোগমত রায় মুবারক, রাহুন, মহরুণ, দুলারা আর কৈমাকে দরীয়া বন্দী করল। গ্রামের বাইরে সে সৈন্যদের বসিয়ে রেখে এসেছিল। তার আদেশ পাওয়া মাত্রই তারা পাঁচজনকে বেঁধে নিয়ে যায়। তখন বন্দীদের অথবা অন্য কারোর কোন জ্ঞান ছিল না।

□

বিজয়ী দরীয়া দিল্লীর দিকে রওনা দিল।

সকাল হতেই লোকেরা সবাই জানতে পারল কেমন করে নাচের ধুম, মদের রিনিঝিনি, আতস বাজীর আলোর মেলায় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। গ্রামের জমিদার সমেত বর, বরের বাবা আর ভায়েদেরও গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। হতচকিত গ্রামবাসীদের সান্ত্বনা দেবার দেখা-শোনা করার কেউ ছিল না। সম্রাটের ভয় এবং রাজদরবারের আতঙ্কে সকলেই

এই অপমান মেনে নিতেও রাজী হয়ে যায়। গড় মুগলানে এই প্রথম কেউ এমন অপমান আর লজ্জা মুখ বুঝে সহ্য করে। সারা সহর একেবারে নিঃঝুম হয়ে পড়ে। তখ্‌ত হাজারার মুষ্টিমেয় কয়েকজন বরযাত্রীরা তার আর কি করতে পারে। দরীয়ার সঙ্গে যে কত সৈন্য সামন্ত রয়েছে সে খবরও কারোর জানা নেই।

গোন্দলা মাথা চাপড়ে কাঁদতে থাকে। মলকীর করুণ বিলাপ চোখে দেখা যায় না, তবু লোকেরা নির্বাক হয়ে থাকে। সারা গড় মুগলান সে দুঃখ নীরবে দেখে, দেখে বরযাত্রীদের সকলেও।

যাবার আগে কৈমার মুখটা পর্যন্ত ভাল করে মলকীর দেখা হয় না, স্বামী জীবিত থাকতে থাকতেই সে বেচারী যেন বিধবা হয়ে গেল।

কিন্তু মলকীর অনমনীয় মনের জোর ছিল। সে এখন কৈমার। পৃথিবীর কারোর এখন আর সাধ্য নেই যে তাকে কৈমার থেকে পৃথক করে। সে দরীয়া কিংবা দরীয়ার বাদশাকে পরোয়া করে না। যে কাজ বাহুবলে করা সম্ভব নয়, বুদ্ধি খাটিয়ে তাতে সফল হওয়া যায়। সে সন্ন্যাসিনী সেজে কৈমার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। প্রিয়তমকে পাবার জন্য সে রাঞ্ঝার মত ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নেয়। বাড়ী থেকে চলে যাবার সময় সে তার মাকে পর্যন্ত কিছু বলে না। তার ভয় ছিল, মা হয়তো তাকে এই দুর্গম পথে যেতে বারণ করবে। কিন্তু সে স্থির সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল এ বিষয়ে অনেক আগেই।

দরীয়ার সৈন্য সামন্তের দল বেশ বিরাট। বন্দীদের হাতে পায়ে লোহার বেড়ি পরানো সত্ত্বেও প্রত্যেকের সঙ্গে তিনজন করে সৈন্য পাহারায় ছিল। মলকী পথিকদের মুখ থেকে এসব খবর সংগ্রহ করে। মলকীর বাবা ও ভায়েদের সিংহের মত বীরত্বব্যঞ্জক মুখ এবং কৈমার অনিন্দ্য সুন্দর রূপ পথিকদের সকলের মনেই দাগ কেটে চলে। সকলে বেঁচে আছে যেনে মলকী কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করে। দুঃখ করার কিছুই নেই, দুঃখের রাত যত দীর্ঘই হোক না কেন, এক সময় তা কাটবেই।

মলকীর পা হিম-ফোসকায় একেবারে ফুটিফাটা হয়ে যায়। তবু সে এই দীর্ঘপথ খালি পায়েই অতিক্রম করবে বলে মনে মনে সংকল্প করে নিয়েছিল। পথের নির্দেশ নেবার তার কোনো দরকারই হচ্ছিল না। পথের ধারে জায়গায় জায়গায় দূরত্ব-ফলক ছিল। দু'মাইল পর পর কুয়ো আর দুধারে গাছ, জায়গায় জায়গায় রাত কাটাবার জন্য সরাইখানার ব্যবস্থা ছিল। পথের যেখানে গাছপালা কম সেখানে গরম মাটিতে হিম-ফোসকায় ক্ষতবিক্ষত পা গরম মাটির তাপে যেন জ্বলে যেতে থাকে। সে ছুটে গিয়ে রাস্তার ধারে ঘাসের ওপরে গিয়ে দাঁড়ায়। পা দুটোকে সামান্য আরাম আর বিশ্রাম দিয়ে সে আবার পথ চলতে শুরু করে। ঘোর নিরাশার সেই অন্ধকারে তার একমাত্র আশার আলো, কৈমা বেঁচে আছে। নইলে দরীয়াকে কোন বিশ্বাস নেই—হয়তো খুন করে কোথাও পুঁতে রেখে দিল আর কি? কখনো সে দরীয়ার দলের সঙ্গে গিয়ে মিশে যেত আবার কখনো পেছনে পড়ে

যেত। এক আধবার সে লুকিয়ে চুরিয়ে কৈমাকে দেখেও গিয়েছে। বড়ই উদাস আর বিষণ্ণ-নিরুপায় সে চেহারা। মলকীর বাবা আর ভায়েদেরও সেই একই অবস্থা।

□

মলকীর কাছে এই যাত্রা হজ তীর্থযাত্রার মতই পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। হজ যাত্রায় তবু আশা পূরণের সম্ভাবনা থাকে, এক্ষেত্রে তাও নেই। একসময় দরীয়ার সৈন্য-বাহিনী কুরুক্ষেত্রের ধারে থানেশ্বর শহরে এসে পৌঁছয়। পেছনে পেছনে মলকীও এসে উপস্থিত।

থানেশ্বরে অন্য এক সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। মলকী সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে বিভূতি নেবার জন্যে গিয়েছিল। কথায় কথায় সেই সন্ন্যাসিনী মলকীর দুঃখের কথা জানতে পারে। তার দুঃখের কাহিনী শুনে সন্ন্যাসিনী মলকীকে আকবরের রাজপুত রাণীর কন্যা যমুনার সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দেয়। সন্ন্যাসিনীর বিশ্বাস যমুনা ইচ্ছা করলে সব কিছুই করতে পারে।

মলকী যমুনার প্রাসাদে ভিক্ষা চাইতে গেলে যমুনা তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। সে ভাবে, এত অল্প বয়সে এই সুন্দরীর সন্ন্যাসিনী হওয়ার নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ আছে। সে মলকীকে তার মহলে ডেকে আনে। মলকী যমুনাকে কৈমার সঙ্গে তার বিয়ের এবং পরবর্তী মর্মান্তিক ঘটনার কথা বলে। যমুনাকে তার সাক্ষাৎ দেবী বলে মনে হতে থাকে। তার কাকা যে তাকে নিজের উন্নতির জন্যে বাদশা আকবরের হারেমে রাখতে চেয়েছিল সে কথাও সে বলে।

হারেমের কথাটা শুনে যমুনা ভীষণ রেগে যায়। মলকীকে কেউ তার নিজের মায়ের সতীন করতে চাইছিল! সতীনের দুঃখ যমুনা ভাল করেই জানে। তার বাবার এই বুড়ো বয়েসের প্রেমের কথাও তার অজানা নয়। বাদশার আদেশে আনারকলির জল্লাদের হাতে মৃত্যু সে দেখেছে, কারণ আনারকলি তার বুড়ো বাপের বদলে সেলিমকে ভালবেসেছিল। যে আনারকলিকে কোতল করাতে পারে সে যে মলকীকে হারেমে বসানোর পর তার মায়ের সঙ্গে আর ভাল ব্যবহার করবে না, তা তার ভাল করেই জানা আছে। মলকীর কথা শোনার পর তার মনে হল যেন তার নিজের মা সন্ন্যাসিনীর বেশে পথে পথে ভিক্ষা চাইছে আর মলকী রাজ দরবারে রাণী হয়ে বসেছে। অবশ্য মলকীকে দেখে তো মনে হয় না সে এমন করতে পারে। কিন্তু করা না করা তো মলকীর হাতে নির্ভর করছে না, করাবে তো বাদশা স্বয়ং।

রাজকুমারী যমুনা একটা কথা ভেবে কেবল সান্ত্বনা পায়, আকবর এখনো দরীয়ার মনের এই উদ্দেশ্য জানেন না। তিনি কেবল জানতেন যে দরীয়া বাদশাহী ফৌজ নিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করতে গেছে, কিন্তু তারা যে কেবল তাদের বোন এমন অপরূপ সুন্দরী বলেই আজ বিদ্রোহী সে খবর বাদশার জানা থাকলে তিনি বন্দীদের সঙ্গে মলকীকেও কয়েদী করে আনার হুকুম দিয়ে দিতেন। মলকীকে

সম্রাটের হাতে তুলে দেবার ব্যাপারে দরীয়ার দেরী করার কারণ হল সে ঠিক করেছিল এই বিদ্রোহীদের প্রথমে দরবারে পেশ করে সে নিজের পদমর্যাদা কিছুটা গুছিয়ে নেবে এবং পরে মলকীকে বাদশার হারেমে তুলে বাকীটা আখের গুছিয়ে নেবে। সে সুযোগ যাতে তার আর না আসে রাজকুমারী যমুনা সে ব্যবস্থা করে। দরীয়াকে ডেকে পাঠিয়ে সে হুকুম দেয় নিরাপরাধ কয়েদীদের মুক্তি দিয়ে তার প্রাসাদে পাঠিয়ে দিতে।

রাজকুমারীর আদেশ শুনে তার নিজের ডেরায় ফিরে আসতে আসতে দরীয়ার খেয়াল হল, বিদ্রোহীদের ব্যাপারে রাজকুমারীর আদেশ শোনার কোন প্রয়োজন নেই। সম্রাট নিজে পরে মেয়েকে বুঝিয়ে দেবেন। সে রাতারাতি কয়েদীদের সেখান থেকে নিয়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

রাজকুমারী যমুনার সঙ্গে মলকীর হৃদ্যতা বেড়ে ওঠে। সে মলকীর সন্ন্যাসিনী বেশভূষা খুলিয়ে তাকে বাদশাহী পোষাকে সাজায়। সারা রাত সে মলকীকে আকবরের নিষ্ঠাবাদিতার কথা বলে শোনায়। মলকীর মন অবশ্য সে সব কথার চেয়ে কৈমার চিন্তাতেই বিভোর ছিল। সকালবেলা সিপাইদের কৈমাকে সেখানে নিয়ে আসবার কথা।

প্রহরীরা সকালে এসে হাজিরা দিতেই মলকী কৈমার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে যায়, কিন্তু কৈমার দেখা পায় না। প্রহরীরা জানাল, দরীয়া রাত থাকতেই কৈমা আর অন্য বন্দীদের নিয়ে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। দরবারের এক সুবেদারের এত বড় স্পর্ধা? রাজকুমারী রাগে ফেটে পড়ে। প্রহরী বেচারারা ভয়ে কাঁপতে থাকে।

যমুনা দিল্লী যাবার জন্য তৈরী হল। সে মলকীকেও তার সঙ্গে নিয়ে নেয়। সারা রাস্তা তার কেবল একটাই ভাবনা হতে থাকে বুড়ো বাদশাকে এই ঘটনা সে কিভাবে জানাবে। দিল্লী পৌঁছানর পর মলকীর কোন কথা বলা বা সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নেয় না যমুনা—সে নিজেই সে দায়িত্ব হাতে তুলে নেয়, কারণ ব্যাপারটা এখন তার নিজের মান সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সবার আগে রাজকুমারী তার মা'র সঙ্গে দেখা করে। যে মেয়েটি তার মায়ের সতীন হতে বসেছিল তাকেও সে দেখায়। সে দরীয়ার ফন্দির কথাও সব খুলে বলে। রাণী আর রাজকুমারী পরামর্শ করে ঠিক করল, বাদশাকে মলকীর কোন কথা না বলেই দরীয়াকে খতম করতে হবে।

বৃদ্ধা মায়ের অন্তরে এক সুতীব্র বেদনাবোধ জেগে ওঠে। বাদশার খোলামেলা স্বভাবের জন্যে রাণী যেমন সুখও পেয়েছে, দুঃখও তাকে কম ভোগ করতে হয়নি। সম্রাট যখন কোন তরুণীর প্রেমে পড়ে রাতের পর রাত দরকারী কাজের বাহানায় রাণীর মহলে আর ফিরতেন না, রাণী সে সময়ের কথা ভুলতে পারেন না। সম্রাট যে কোন জরুরী কাজের জন্য বাইরে রাত কাটাতেন তাও রাণীর অজানা ছিল না। রাণী বেশ ভাল করেই জানতেন তার বয়স বাড়ার সাথে সাথেই সম্রাটের এই জরুরী

কাজও ক্রমশঃ বেশি বেড়ে গেছে। রাণী তাঁর এই দুঃখকে আর বাড়াতে দিতে চান না। তার নিজের মেয়ের থেকেও কম বয়সী তার সতীন তো আজ তার সামনেই বসে রয়েছে!

দরীয়া রাণীর দুচোখের বিষ হয়ে উঠল। তিনি ঠিক করলেন, দরীয়াকে শেষ না করে তিনি স্বস্তি নেবেন না।

সেদিন সম্রাটের মহলে ফিরে আসার সময়ে রাণীর আদেশে মহলের সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। বাতি, ঝাড়লণ্ঠন ভেঙ্গে ফেলা হল। রাণী তার সাজসজ্জা ত্যাগ করলেন। বাদশা এসে দেখলেন, রাণী শয্যা নিয়েছেন।

সব কিছু দেখে শুনে সম্রাট খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাণীর এভাবে নালিশ জানানোর মত কাজ আজ তো তিনি করেন নি, তিনি ভাল করেই সে কথা জানতেন। তাছাড়া তার বিবাহিত জীবনে এই প্রথম তিনি রাণীকে এভাবে রাগ প্রকাশ করতে দেখলেন। আজ পর্যন্ত সে কখনো কোনো ব্যাপারে রাগ দেখায়নি। আজ এমন কি ঘটনা ঘটল! সম্রাট ভেবে কূল পান না।

সম্রাট রাণীর কাছে নত হলেন। সম্রাটকে নরম হতে দেখে রাণী রায় মুবারক আর তার সঙ্গীদের মুক্তি ভিক্ষা করলেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের মুক্তি দেবার ক্ষমতা একা সম্রাটের নেই। এদের বিচার সংযুক্তভাবে কেবল মন্ত্রিসভা করতে পারে। তাছাড়া, বিদ্রোহীকে মুক্তি দিতে হলে উপযুক্ত প্রমাণ দরকার। রাণীর কাছে তেমন কোন প্রমাণ নেই। দরীয়া যদি তার নিজের ভাইকে বিদ্রোহী বলে তো সেটা যে ভুল তা কি করে প্রমাণ করা যায়?

ব্যাপারটা খুবই জটিল। সম্রাট আকবর ন্যায়-নিষ্ঠার জন্য সারা দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ। বিনা কারণে তিনি কাউকে ফাঁসীর হুকুম কি করে দিতে পারেন? আর দরীয়ার মলকীকে সম্রাটের হারেমে এনে তোলার ফন্দিটা তো প্রমাণ হিসেবে পেশ করা চলে না—সে তো নিজের পায়েই কুড়ুল মারার সমান। সম্রাট শেষকালে মলকীর রূপে মোহিত হয়ে যেতে পারেন।

রাণী তার দুঃখের কথা ভাই বীরবলকে জানালেন। বীরবলের কাছে সব সমস্যাই জলের মত সোজা সে বোঝাল, জাঠ-জমিদারদের মধ্যে নিজের ভাইকে কোতল করানো সাধারণ ব্যাপার। হয়তো নিজের ভাইকে বিদ্রোহী প্রমাণ করার পিছনে দরীয়ার কোন মতলব রয়েছে। রায় মুবারক আর তার উত্তরাধিকারীদের মৃত্যুর পর তার জমিদারী দরীয়াই পাবে। এমন নীচ মনের অধিকারী দরীয়াকে ফাঁসী দেওয়া তেমনিই সরল। সম্রাটের এর থেকে আর বড় কোন প্রমাণের দরকার ছিল না। তিনি তাঁর বিচারের রায় সকলকে শুনিয়ে দিলেন।

ফাঁসীর আগে দরীয়ার শেষ বাসনা জানতে চাওয়া হল। কিন্তু দরীয়ার সব বাসনাই তখন শেষ হয়ে গেছে। উঁচু পদ আর প্রতিশোধের চিন্তা তার মনে যে নেশার সৃষ্টি করেছিল তা তখন কেটে গেছে। তার শেষ বাসনা কিই-বা আর থাকতে পারে। সে কৈমা আর মলকীকে ডেকে পাঠিয়ে মলকীর হাত কৈমার

হাতে তুলে দেয়। সে দৃশ্য দেখে রায় মুবারক আর তার পরিবারের অন্য সকলের চোখে জল এসে যায়। দরীয়ার চোখেও তখন জলের ধারা। বড়দাদার কাছে ক্ষমা চেয়ে সে ফাঁসীর মঞ্চে উঠে যায়।

সেই রাতে যমুনার তীরে কৈমা আর মলকী দুজনে প্রথম একান্তে মিলিত হল। চাঁদনী রাতের জ্যোৎস্না, নদীর নিরালা অবসর, ভরা নদীর প্রশান্তরূপ আর দরীয়ার শেষ সময়ের অনুশোচনা তাদের দুজনকে আরো নিবিড়ভাবে কাছে এনে দেয়।

কৈমার তৃষিত আলিঙ্গনে ধরা পড়ে খুশির আনন্দে মলকীর দুচোখের কানায় কানায় জল ভরে আসে।
